# শুকতারা

ষষ্ঠ সংখ্যা
শ্রাবণ • ১৩৮৩


## সর্পরাজের দ্বীপে

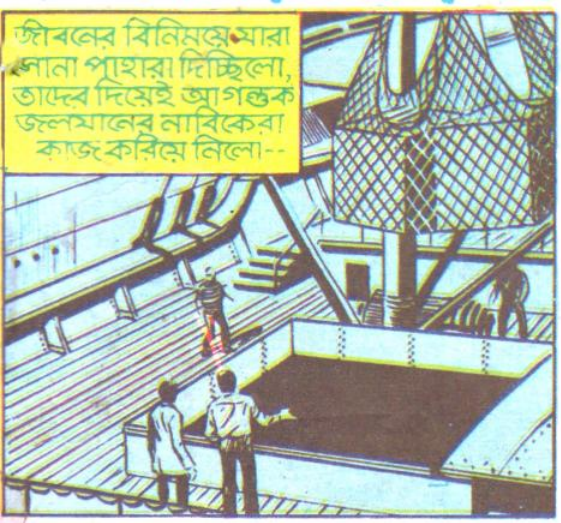

## পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - শঙ্খ মজুমদার

স্ক্যান করেছেন - রাজর্ষি দত্ত ধর

এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

## একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোন পত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি আমাদের এই অভিযানে সঙ্গী হতে চান তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

# বিশ্ব-পরিচয়

মানেই

## পৃথিবীর ইতিহাস

পৃথিবীর প্রতিটি দেশের বিবরণ

**পাঁচশতাধিক একবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্রে সমৃদ্ধ ৭০০ পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ। আধুনিক গেট আপ, সুদৃশ্য বাঁধাই। দাম ৪০ টাকা।**

৪০ টাকা পাঠালে রেজেস্টারী করে পাঠান হয়।

**দেব সাহিত্য কুটীর** / ২২/৫ বি ঝামাপুকুর লেন / কলি

# বাঁটুল দি গ্রেট



তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নে। কাঠ চ্যালা করতে হবে! আর এটা তোদের পাহারা দেবে!
অতো সোজা নয়! এই দ্যাখ হ্যাণ্ডকাফ!
পাখির খাবারের প্যাকেটে এখন ব্যাটা উটপাখির মাথা ঢাকার জন্য কিছু দেখতে পারবে না। এই তালে টেবিলের পায়া আর ওর পায়ে হ্যাণ্ড-কাফ লাগিয়ে দি!
দ্যাখ! ছোঁড়াদুটো পালাচ্ছে! শিগগির পেছনে ছোট!
আমাদের দিয়ে কাঠ চ্যালা করা হবে না—আমরা হাওয়া দিচ্ছি!
টেবিল শূন্যে উড়ে যাচ্ছে-এ সব কি হচ্ছে?
এঃ!
গ্যাকাস্!
ছোঁড়াদুটোর কীর্তি! ওরা আমার পোষা উটপাখির পা আর টেবিলের পায়ার সঙ্গে হ্যাণ্ডকাফ লাগিয়ে রেখেছিলো!
আমার কাছে খোলবার চাবি নেই, তাই কামড়েই খুলে ফেলি!
তুই উড়তে পারলে ওপরে উঠে ওরা কোথায় তা দেখতে পারতিস।
তাড়াতাড়ি ডানা ঝাপটাতে পারিস না বলে তুই উড়তে পারিস না।
আমার পিঠে চেপে বোস। দেখি আমি তোর ডানা তাড়াতাড়ি ঝাপটাতে পারি কি না!

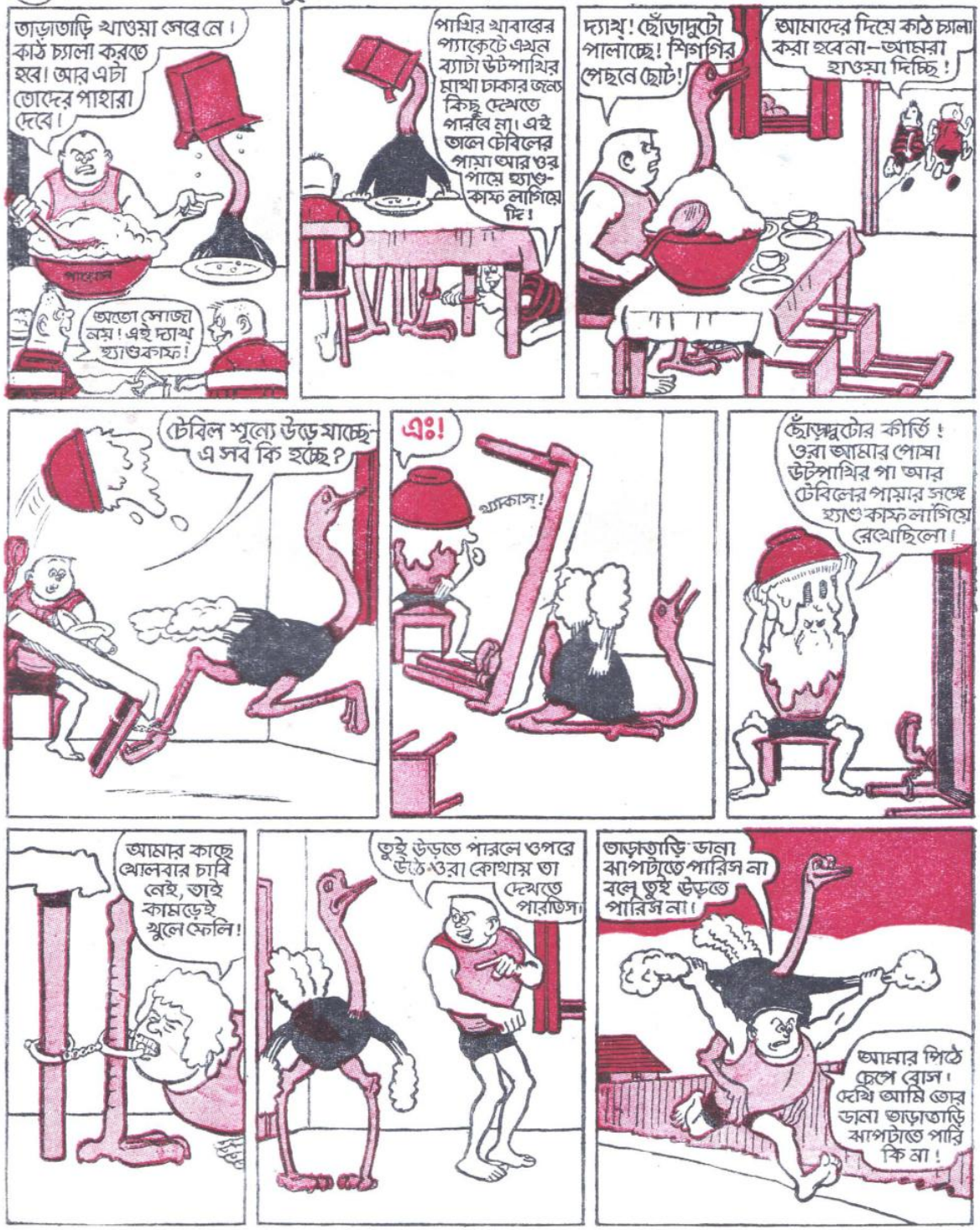

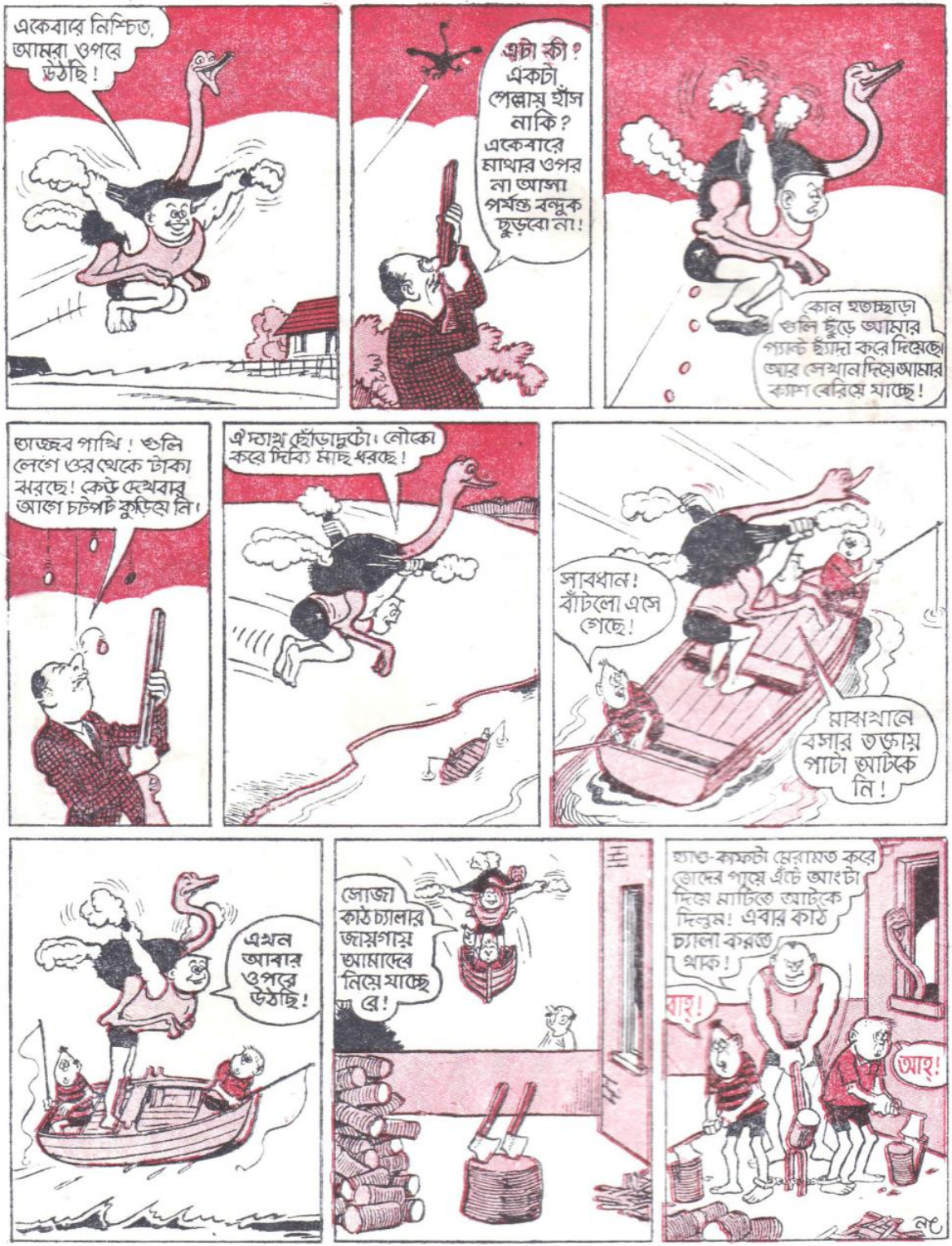
একেবারে নিশ্চিত, আমরা ওপরে উঠছি!
এটা কী? একটা পেল্লায় হাঁস নাকি? একেবারে মাথার ওপর না আসা পর্যন্ত বন্দুক ছুড়বো না!
কোন হতচ্ছাড়া গুলি ছুঁড়ে আমার প্যান্ট ছ্যাঁদা করে দিয়েছে! আর সেখান দিয়ে আমার ক্যাশ বেরিয়ে যাচ্ছে!
তাজ্জব পাখি! গুলি লেগে ওর থেকে টাকা ঝরছে! কেউ দেখবার আগে চটপট কুড়িয়ে নি।
ঐ দ্যাখ ছোঁড়াদুটো। নৌকো করে দিব্যি মাছ ধরছে!
সাবধান! বাঁটলো এসে গেছে!
মাঝখানে বসার তক্তায় পাটা আটকে নি!
এখন আবার ওপরে উঠছি!
সোজা কাঠ চ্যালার জায়গায় আমাদের নিয়ে যাচ্ছে রে!
হাত-কাফটা মেরামত করে তাদের পায়ে এঁটে আংটা দিয়ে মাটিতে আটকে দিলুম! এবার কাঠ চ্যালা করতে থাক!
বাহ!
আহ!

# "শুকতারা"

Approved by the Directorate of Public Instruction, West Bengal as Children's Monthly Magazine Vide, No. 321 (9) T. B. C.

*( Dated 14th August, 1971, 2B-20G/71 )*


## সূচীপত্র—শ্রাবণ, ১৩৮৩


| | বিষয় | লেখক-লেখিকা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ১। | সর্পরাজের দ্বীপে ( সচিত্র চিত্র-কাহিনী ) | —নারায়ণ দেবনাথ ... | প্রচ্ছদপট |
| ২। | বাঁটুল দি গ্রেট | —নারায়ণ দেবনাথ | প্রথম ছবি |
| ৩। | বরাত ( কবিতা ) | —শ্রীরাজারাম চৌধুরী ... | ৪০৩ |
| ৪। | বৈকুণ্ঠ শুকুল ( শহীদ স্মৃতিকথা ) | —অলক ঘোষ ... | ৪০৫ |
| ৫। | বড় হলে ছোট হয় ( জীবন কথা ) | পূরবী দেবী ... | ৪১১ |
| ৬। | এ এক জন্মের কাহিনী ( জাতকের গল্প ) | —গোরাচাঁদ পাল ... | ৪১২ |
| ৭। | মজার খেলা | ... | ৪১৫ |
| ৮। | নাজিরের বড়দিন ( বিদেশী গল্প ) | —দিনকর শর্মা ... | ৪১৬ |
| ৯। | যুগে যুগে ( ছবিতে গল্প ) | —দিলীপ দাস ... | ৪২২ |
| ১০। | বীর ছেলে বাংলার ( ধারাবাহিক উপন্যাস ) | —শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা ... | ৪২৪ |
| ১১। | ভূতদেখা ( গল্প ) | —রণজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ... | ৪৩০ |
| ১২। | ৪১৫ পৃষ্ঠার মজার খেলার উত্তর | | ৪৩৪ |
| ১৩। | যাদুকর ও রাজপুত্র ( গল্প ) | —অসীম চট্টোপাধ্যায় ... | ৪৩৫ |
| ১৪। | চোখের ভুল ( মজার ছবি ) ... | | ৪৪০ |
| ১৫। | গেহলোট-রত্ন রতন রাণা ( অমর বীর কাহিনী ) | —শ্রীমধুসূদন মজুমদার | ৪৪১ |
| ১৬। | রূপকথার ফুলঝুরি ( গল্প ) | —ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য | ৪৪৭ |
| ১৭। | কালো বাঘের থাবা ( ছবিতে গল্প ) | —শ্রীতুষার চ্যাটার্জী ... | ৪৫৪ |
| ১৮। | স্বর্গোদ্যান—বিধান শিশু উদ্যান ( প্রবন্ধ ) | —শতদল ভট্টাচার্য ... | ৪৫৬ |
| ১৯। | ফাঁদ দেখেছে ( কার্টুন ) | —আশু | ৪৫৯ |
| ২০। | হাঁদা-ভোঁদার জোড়াদার (ছবিতে গল্প) | | ৪৬০ |
| ২১। | রঙ্গ দেখ বিশ্বনাথের ( প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা ) | —অপর্ণা চট্টোপাধ্যায় | ৪৬২ |
| ২২। | অলৌকিক ( দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা ) | —শ্রীঅলোক বাগচী ... | ৪৬৪ |
| ২৩। | "৺সৌরভকুমার সাহা স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা" ( ঘোষণা ) ... | | ৪৬৬ |
| ২৪। | মিথ্যের পুরস্কার ( বিদেশী রূপকথা ) | —গৌতম চক্রবর্তী ... | ৪৬৭ |
| ২৫। | মজার পাতা ( ধাঁধা ইত্যাদি ) ... | | ৪৬৯ |
| ২৬। | আজব দোকান ( ভৌতিক গল্প ) | —শৈলেশ ভড় ... | ৪৭১ |



এস. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ ৬৮, কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১১নং ঝামাপুকুর লেন কলিকাতা হইতে শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীমধুসূদন মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত।

মূল্য টা. ১·২৫

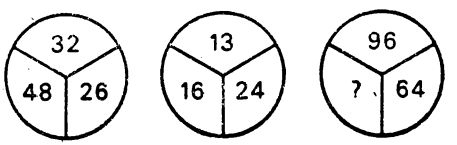

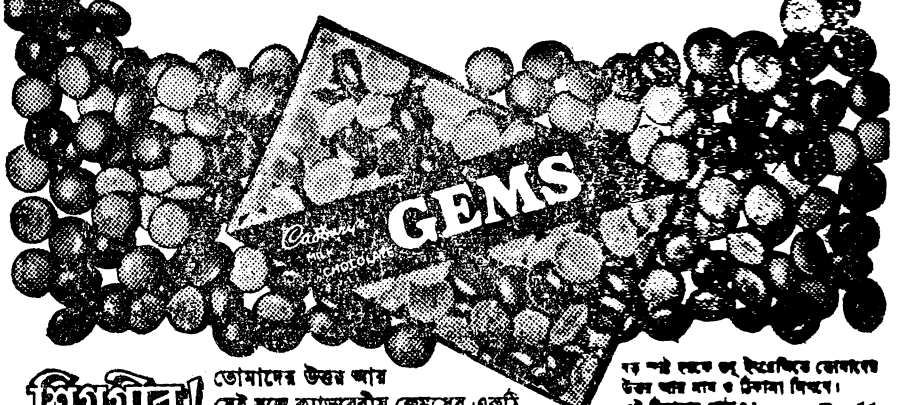

জেমসের মজার আসর
৫০০টি পুরস্কার জিতে নাও!
সেই সঙ্গে অতিরিক্ত বড় রকম পুরস্কারের সম্ভাবনা
যে সংখ্যাটি নেই সেটি কি ?
32 48 26
13 16 24
96 ? 64
GEMS
Cadbury's MILK CHOCOLATE
শিগগির!
তোমাদের উত্তর আর
সেই সঙ্গে ক্যাডবেরীস জেমসের একটি
খালি প্লাস্টিক প্যাকেট পাঠিয়ে দিও। প্রথম
৫০০ জন যারা সঠিক উত্তর পাঠাবে তারা প্রত্যেকে ১১ টাকার স্টেট ব্যাঙ্ক
গিফ্‌ট চেক পাবে। আর যদি তোমার বরাত ভাল, তোমার গিফ্‌ট চেকের
উপর আরো ৪০০ টাকা পাবার সম্ভাবনা আছে—ভাগ্যবান বিজেতাদের
অতিরিক্ত পুরস্কার।
B—11
"Fun with Gems" Dept.
রঙ বেরঙের, চকলেটে ভরা ক্যাডবেরীস্ জেমস
CHAITRA-C-39 BEN

উনত্রিংশ বর্ষ ● ৬ষ্ঠ সংখ্যা ● ১৩৮৩, শ্রাবণ

# বরাত

শ্রীরাজারাম চৌধুরী

জোর কদমে এবার শুরু
করতে হবে পড়া
সময় যেন নষ্ট না হয়
খাওয়া শোওয়া ছাড়া।

সারা বছর দিয়ে ফাঁকি
পরীক্ষার যেই মাসেক বাকি
ভাবতে বসে বজ্রভূষণ
তৎক্ষণাৎ এই করল পণ।

আজ সিনেমা কালকে খেলা
কোনটাই ত যায় না ফেলা;
মনের সাথে দ্বন্দ্বে মেতে
সন্ধি হল সোম প্রভাতে
শুরু হবে পড়াশোনা
বন্ধুদের সব করবে মানা।

রবিবারের শেষ প্রহরে
মটর গাড়ির হর্ণ বাজিয়ে
মাসী এলেন কাশী থেকে
অনেক জিনিস সঙ্গে নিয়ে।

মঞ্জুরানী মায়ের সাথে
এসেই গেল দাদার খোঁজে
হৈ হুল্লোড় গেল পড়ে
সাতটা দিন ত কিছুই নারে।

বজ্রের নয় ভুলো মন
দ্বিগুণ জোরে করল পণ।

সোমের প্রাতে সূর্য ওঠে
দূরের শাখে কোকিল ডাকে
তাকের থেকে কেতাব পেড়ে
বজ্র ভাবে কোনটা ধরে,—
হে-কালে রিক্সা করে
এলেন পিসী সদলবলে।

থাকব বলে দুদিন বেশ
বিদায় নিলেন শনির শেষ।
গরীব পিসীর ভালবাসা
দেখবে শুনবে এই ত আশা।

সুখ-দুঃখের জোয়ার কাটি
গড়িয়ে গেল হপ্তাদুটি।

বাঁধল কোমর বজ্রভূষণ
করবে এবার চরম-সাধন।

খবর এল শনিবার
পাড়ায় বিয়ে পার্থদার
মাঝে মাঝে যেতেই হবে
বিকাশ সেথায় মেতেই আছে।

অবুঝ মনকে বোঝাতে চায়
ভাগ্য তাহার খারাপ নয়।
পড় আছে একশ বার
বিয়ে ত নয় বার বার।

পরীক্ষার দিন সাতেক বাকি
বজ্র দিল দুয়ার আঁটি
ভয়ে ভয়ে করল শুরু
বাছল বিষয় সরল গুরু।

প্রশ্ন দেখে পরীক্ষায়
প্রমাদ গোণে হতাশায়।
ফল বেরোলে সঙ্গী সাথী
বোঝায় বরাত খারাপ অতি।

# বৈকুণ্ঠ শুকুল

অলক্ত ঘোষ

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার উপর যবনিকাপাত হল ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরু প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার পর।

অন্ততঃ সেই রকমই ধারণা পুলিসের।

অতঃপর হিন্দুস্থান গণতন্ত্রী বাহিনীর নাম আর শোনা যাবে না হিন্দুস্থানে, এই তাদের বিশ্বাস। বাহিনীর কোন কোন সদস্য এখনও জীবিতই রইল অবশ্য, কিন্তু ঐ তিন মুখ্য বিপ্লবীর এই কঠোর শাস্তি স্বচক্ষে দেখার পরে তারা কি আর মাথা তুলতে সাহস পাবে?

পুলিসের আশা যে, তারা তা পাবে না।

কিন্তু ফণি ঘোষের বিশ্বাস অন্য রকম।

ফণি ঘোষ! যার নাম উচ্চারণ করতে হলে তার আগে ও পরে যে কোন বিপ্লবী নিষ্ঠীবন ত্যাগ করবে বারংবার। অভিশাপ! ফণি ঘোষের জন্য অভিশাপ ছাড়া অন্য কিছু নেই কোন বিপ্লবীর রসনায়।

অথচ অন্য সব বিপ্লবীর মতই ফণিও আদর্শবান যুবক ছিল একদিন। আদর্শনিষ্ঠা আর দেশপ্রেম, এই দুইয়ে মিলেই ঘর ছাড়া করেছিল তাকেও। ঘরে তার সব ছিল। বাংলাদেশের এক ছায়াচ্ছন্ন গ্রামে শান্তির নীড় একখানি কুটির ছিল তার। জমিজায়গা, বাগান পুকুর ছিল। স্নেহশীল আত্মীয়-বান্ধব ছিল নানাস্থানে। এক কথায় একটা নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রসন্তানের জীবনকে সুখে শান্তিতে ভরে দেওয়ার জন্য যে কয়টি জিনিসের দরকার, তা সবই ছিল তার।

বৃদ্ধা জননী তার বিবাহের ব্যবস্থা করছিলেন। ফণি বলল—"দুইদিন সবুর কর মা! একটা চাকরি জোটাই আগে। জমির ফসলে দিন এখনও চলছে বটে, কিন্তু মালপত্রের দাম দিন দিন যেমন বেড়ে যাচ্ছে, তাতে আর বেশীদিন তা চলবে না। এর সঙ্গে নগদ দুই পয়সা আমদানি যদি হয় সংসারে, তবে আর ভাবনা থাকে না কিছু। আগে

একটা চাকরি বাধাই, বিয়ে ত আর ফসকে যাবে না দুদিন সবুর করলে !"

মা দেখলেন ছেলের কথায় যুক্তি আছে। "বিয়ে করলেই পুত্র কন্যা, আসে যেন প্রলয়বন্যা" —দ্বিজু রায়ের এ কবিতা অবশ্য কোনদিন তাঁর শ্রবণে পশেনি। কিন্তু ও-বাণীর অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত গৃহস্থমাত্রেই বোঝে। নাতি-নাতনির বন্যায় সংসার ভেসে যাওয়ার আগে ফণি যদি সে-সংসারের চার ধারে বাঁধা মাইনের একটা উঁচু বাঁধ দিতে চায় ও দিতে সক্ষম হয়, সে ত উত্তম কথা। তিনি প্রসন্ন হয়েই ফণিকে সে চেষ্টায় অনুমতি দিলেন। ফণি কলকাতায় গেল।

চাকরি পেতে হলে নানাজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে হয়। করল ফণিও। এই সূত্রে এমন কতিপয় যুবকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল তার, যারা ছিল বিপ্লবী দলের তৃতীয় শ্রেণীর সদস্য। তৃতীয় শ্রেণী তাদেরই বলা হত, যারা সক্রিয় সদস্যদের চরের কাজ করে, কর্মীর সন্ধান এনে দেয়, অন্যবিধ ফর্মাইস খাটে।

কাজ এদের এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু অন্তরঙ্গমহলে বাতচিৎ এদের লম্বাচওড়া। বক্তৃতার মুখে কখনও এরা রাসবিহারী বোসের হরিহরাত্মা বন্ধু বলে আত্ম-পরিচয় দিচ্ছে, কখনো বা বাঘা যতীনের দক্ষিণ হস্ত বলে। ফণির সঙ্গে দুই চার দিন মেলামেশা করার পরে এদের কারও কারও ধারণা হল যে, এ-ছোকরা সুযোগ পেলে উঁচু দরের কর্মী হয়ে উঠবে একদিন। ফণির কথা তারা গিয়ে নেতৃমহলে নিবেদন করল।

নেতারা ডাকলেন ফণিকে।

সে অনেক কিছু রহস্যাবৃত অনুষ্ঠান, রহস্যাবৃত এবং রোমাঞ্চকর। চোখ বেঁধে ফণিকে নিয়ে যাওয়া হল কোন এক এঁদো গলির ভগ্ন পরিত্যক্ত এক গৃহে। সেখানে কর্তারা কয়েকজন বসে আছেন, সমুখে ধূপের ধোঁয়ার ঘন অন্তরাল। সেই ধোঁয়াকে মাঝে রেখে আলাপচারি চলল কিছুক্ষণ। ফণির নাড়ি-নক্ষত্রের খবর, আশা-ভরসার কথা, সব কিছু জেনে নিলেন অদৃশ্য কর্তাব্যক্তিরা। তারপরে ফণিকে পাশের ঘরে নিয়ে বসান হল, নাম সই করতে বলা হল কয়েকখানা খাতায় পর পর। এটা ভড়ং মাত্র। আসলে ফণি যতক্ষণ নাম সই করছিল, কর্তারা সবাই দেয়ালের ফোকর দিয়ে ভাল করে দেখে নিচ্ছিলেন তার চেহারা। পাশের ঘরে ত দেখার সুযোগ হয়নি ধোঁয়ার জন্য!

যা হোক, ফণি জানল যে তাকে পছন্দ করেছেন স্থানীয় নায়কেরা। অতঃপর তাকে যেতে হবে বাংলার বাইরে, সেখানে কোন এক গুপ্ত শিবিরে সমুচিত শিক্ষালাভের পরে সৈনিকশ্রেণীতে উন্নীত হবে সে।

বাংলার বাইরে যেতে হবে? মনটা একবার কেমন করে উঠল ফণির। বাড়ি ঘর, বুড়ী মা, অনাগতা বধূ, সবকিছু ছেড়ে দিয়ে পথে পথে ভেসে বেড়াতে হবে? মনটা দুর্বলই হয়ে গেল এক মুহূর্তের জন্য।

কিন্তু সেটা মাত্র এক মুহূর্তেরই জন্য। বিস্ময়ের নেশায়, মহৎ কিছু করতে যাচ্ছি এই রকম একটা উপলব্ধির আত্মপ্রসাদে সে তখন বুঁদ হয়ে গিয়েছে। দুর্বলতাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে তার দেরি হল না। সে চলে গেল লাহোর।

লাহোরে হিন্দুস্থান গণতন্ত্রী বাহিনীর সুপরিচালিত শিক্ষা শিবির রয়েছে। সেখানে অস্ত্রচালনার সঙ্গে আরও অনেক অনেক বিষয় শিক্ষা করল ফণি, আরও অনেক অনেক নয়া রংরূটের সঙ্গে। তা ছাড়া নেতৃস্থানীয় প্রথম সারির বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যও সে লাভ করল। নেতারাও ফণির দিকে আকৃষ্ট হলেন এই দেখে

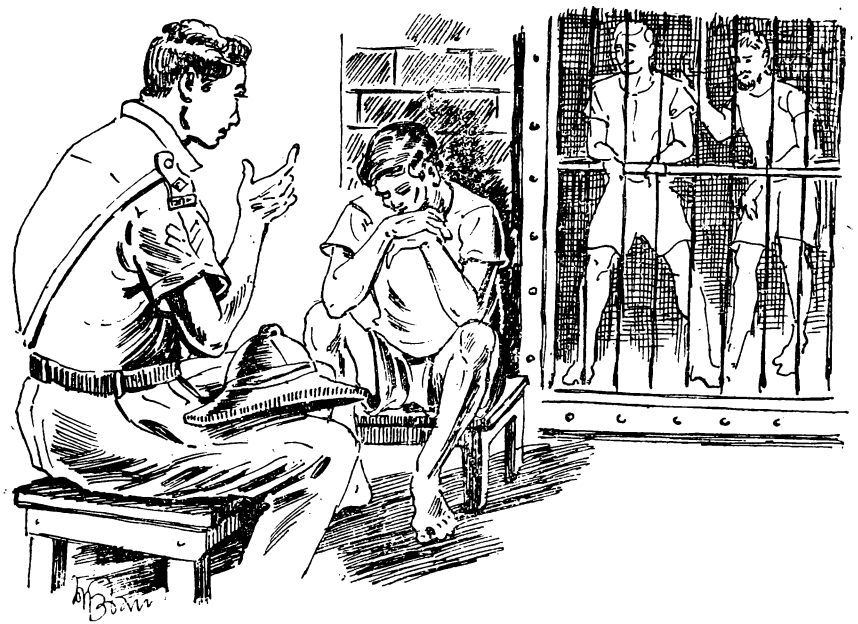

—"এটা ত বোঝো যে রাজদ্রোহ মহাপাপ ?"

যে, অনন্যসুলভ একটা উদ্দীপনা তার ভিতরে আছে, যার দরুন সম্ভাব্য বিপদ-আপদের আশঙ্কা তার মনে ঠাঁইই পায় না।

ক্রমে গণতন্ত্রী বাহিনীর গোপন মন্ত্রণা সভাতেও তার ডাক পড়তে লাগল মাঝে মাঝে। নিজেকে একটা উঁচু দরের বিপ্লবী বলে মনে করতে লাগল ফণি। বলতে গেলে ধরার ধূলা ছেড়ে সে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে কোন এক উন্নততর মহত্ত্বর নতুন জগতে।

এই সর্বগ্রাসী মোহের আবেশ কিন্তু ভেঙেও গেল একদিন রূঢ় আঘাতে। সব বিপ্লবীরাই প্রাণ নিয়ে পালাতে লাগল গোপন আশ্রয়ে। ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরু ধরা পড়েছে। তাদের সঙ্গী সহকর্মীদের গ্রেফতার করার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছে পুলিস।

ফণি ত বিদেশী মানুষ লাহোরে! নিরাপদ আশ্রয় জোটানো খুবই কঠিন তার পক্ষে। সে ধরা পড়ে গেল। বিচার শুরু হল লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার। অন্যান্যদের সঙ্গে ফণি ঘোষও আসামী। তবে হত্যা বা হত্যার চেষ্টার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে নেই। যা আছে, তা হল মামুলী রাজদ্রোহ এবং ষড়যন্ত্রের অভিযোগ। ফাঁসির ভয় তার নেই। দ্বীপান্তরেরও না বোধ হয়। বড় জোর দশ বছর জেল হতে পারে তার, অন্য আসামীরা তাকে আশ্বাস দিল।

বড় জোর ? দশ বছর জেল ? কথা শুনেই মূর্ছা যাওয়ার মত অবস্থা ফণির। বিপ্লবের নেশা টুটে গেল তার এক নিমেষে। বাড়ির কথা, মায়ের কথা বড় বেশী মনে পড়তে লাগল। ভয়ানক রকম মুষড়ে পড়ল সে।

পুলিস নিত্যই তাদের ফুসলাচ্ছে। সবাইকেই বোঝাচ্ছে—"সরকার পক্ষে সাক্ষী হয়ে যাও। মিছে কেন দশ বছর জেলে পচে মরবে ? এটা ত বোঝো যে রাজদ্রোহ মহাপাপ ? তার প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে একমাত্র উপায়ে। সে উপায় হল অকপটে সত্য কথা বলে দেওয়া। বেকসুর খালাস ত পাবেই, তা ছাড়া ভবিষ্যতে যাতে পরম আরামে দিন কাটাতে পার, গভর্নমেণ্ট সে ব্যবস্থা করবেন।"

ফণির মন দুর্বল। অন্য সবাই এ-হীন প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করল, কিন্তু ফণি তা করল না। সে জিজ্ঞাসা করল—"আপনাদের কথা মত কাজ করলে বিপ্লবীরা কি আমায় আস্ত রাখবে? খুন করে ফেলবে না?"

"সাধ্য কী?" হেসে উঠলেন পুলিসকর্তা—"আমরা বডিগার্ড দেব তোমায়। যেখানে থাকবে, চব্বিশ ঘণ্টা সাদা পোশাকের সশস্ত্র পুলিস থাকবে তোমার পাহারায়। তা ছাড়া এই বিপ্লবীরা আর কয়দিন? দেখছ ত তোমরা সবাই ধরা পড়ে গেলে! অমনি ভাবে সব দলই ধরা পড়ে যাবে ছয় মাসের মধ্যে। বিপ্লব নিশ্চিহ্ন হতে বাকী নেই আর। দুই দিনে সব ঠাণ্ডা করে দেবে ইংরেজ সরকার। জান ত? নেপোলিয়াঁ এঁটে উঠতে পারেনি ওদের সঙ্গে, তোমরা ত দুর্বল ভারতবাসী মাত্র!"

ফণি এর জবাবে বলতে পারত যে, পুলিস সাহেব, যিনি দুর্বল ভারতবাসী বলে গঞ্জনা দিচ্ছেন তাকে, তিনি নিজেও তাই ছাড়া অন্য কিছুই নন। তার মন চাইছে পুলিসের কথামত কাজ করে নিজের প্রাণ বাঁচাতে। এ-সময়ে অপ্রিয় পুলিসকে অপ্রিয় কথা বলে লাভ কী?

কথা বাড়িয়ে ফল নেই। দুই চার দিন দোয়ামনা ভাব দেখাবার পরে ফণি একদিন রাজী হয়ে গেল পুলিসের প্রস্তাবে। জেলখানায় তার জন্য স্বতন্ত্র বাসস্থানের ব্যবস্থা হল, কড়া পাহারা বসল তার সেল-এর সামনে। গভীর রাত পর্যন্ত হোমরা-চোমরা পুলিস অফিসারেরা সেখানে বসে তার কাছ থেকে বিপ্লবীদের সব কথা জেনে নিতে এবং আদালতে দাঁড়িয়ে তাকে কোন্ কথা বলতে হবে এবং চেপে যেতে হবে কোন্ কথা, তার তালিম দিতে থাকলেন সোৎসাহে।

সাচ্চা বিপ্লবীদের ওদিকে টনক নড়েছে। তারা খবর পেয়েছে সহানুভূতিশীল ওয়ার্ডারদের মুখ থেকেই। ফণির বেইমানির আঁচ পেয়ে তারা ক্ষোভে রোষে দাঁতে দাঁত ঘষছে কিন্তু এই মুহূর্তেই করবার মত কিছু চোখে পড়ছে না তাদের। ফণি তাদের মধ্যে নেই। থাকলে সেই দশাই তার হত, যা হয়েছিল আলিপুর বোমার মামলার সময়ে নরেন গোঁসাই-এর।

মামলা উঠল লাহোর ষড়যন্ত্রের। মামলা একদিন শেষও হল। ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরুর হয়ে গেল প্রাণদণ্ড। দীর্ঘ দীর্ঘ কারাদণ্ডও হল অনেকের। পুলিস অকপটে স্বীকার করল যে ফণি ঘোষ রাজসাক্ষী হয়ে না দাঁড়ালে অনেক অপরাধীই বেকসুর খালাস পেয়ে যেত।

তারপরও ফণি ঘোষকে নিয়ে মাতামাতি কম চলল না। একটার পরে আর একটা মামলা জুড়ে দেয় পুলিস। সবেতেই ফণি ঘোষ রাজসাক্ষী। মতিহারি ষড়যন্ত্র মামলা, পাটনা ষড়যন্ত্র মামলা, মৌলনিয়া ডাকাতি মামলা—কত কী! সব চেয়ে জোরালো সাক্ষ্য ফণি ঘোষের। বিপ্লবী সংস্থার যেখানে যে শাখা ছিল, সব ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তার ঘরসন্ধানীগিরির ফলে।

এইবার ফণি ঘোষকে বকশিশ দেবার পালা। "তুমি কি বাংলা দেশে ফিরে যেতে চাও এক্ষুণি?" জিজ্ঞাসা করল পুলিস।

ভেবে-চিন্তে ফণি বলল—"এক্ষুণি না। এই দিকেই কোথাও থাকতে চাই কয়েক বছর। পয়সা-কড়ি জমাই কিছু, তারপর দেশে যাব। এখানে আপনারা যতখানি নজর রাখবেন আমার উপরে, আপনাদের শত উপদেশ সত্ত্বেও বাংলার পুলিস তা রাখবে না। তা ছাড়া মা আর বেঁচে নেই। বাড়ি ফেরার তাগিদ নেই আমার।"

আসল কথা বাংলায় ফেরা নিরাপদ বিবেচনা করছে না ফণি। নরেন গোঁসাই-এর ভাগ্যের কথা

মনে আছে তার। ওর কুকীর্তির কথা ত বাংলার বিপ্লবীদের অজানা নেই। গেলেই কচুকাটা হতে হবে। তা ছাড়া নিজের গ্রামে গিয়ে মুখই বা দেখাবে কেমন করে? সেখানে পুলিস মানে ত গিরিধারী চৌকিদার। তার সাধ্য হবে না ফণিকে বিপ্লবীদের প্রতিহিংসা থেকে রক্ষা করা।

ফণি গেল না নিজের মুলুকে। গভর্নমেণ্ট তাকে বেতিয়ায় দোকান করে দিলেন বহু টাকা খরচ করে। তাকে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দেবার জন্য বেতিয়া পুলিসের উপরে রইল কড়া নির্দেশ। দিনে রাতে সর্বদা সাদা পোশাকের পুলিস আশেপাশে রয়েছে তার, রিভলবার পকেটে নিয়ে।

স্থানীয় লোক অবশ্য সে বন্দোবস্তের কথা জানে না। জানলে তার দোকান জমে উঠতে পারত কিনা সন্দেহ। ব্যাপার যা দেখা গেল, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ফেঁপে উঠল সে-দোকান। তার চেয়েও যা আনন্দের কথা ফণির পক্ষে, বিপ্লবীরা লাগেনি তার পিছনে। অবশ্যই তার বর্তমান ঠিকানা অজ্ঞাত রয়ে গিয়েছে তাদের। পুলিসী ব্যবস্থার তারিফ না করে পারে না ফণি। আর কিছুদিন এইভাবে কাটলে তার কুকীর্তির কথা ভুলে যাবে বিপ্লবীরা। তখন ইচ্ছা করলে সে অনায়াসে ফিরে যেতে পারবে নিজের দেশে।

কিন্তু বিপ্লবীদলে অতদিন কাটিয়ে এসেও বিপ্লবীদের সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা কিছু করে উঠতে পারেনি বেচারি ফণি। হঠাৎই একদিন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হল তার মাথায়।

ফণির দোকানের পাশেই গণেশ গুপ্তর দোকান। গণেশের সঙ্গে বেশ একটু বন্ধুত্বই হয়েছে ফণির। সন্ধ্যা ৭টা তখন, ১৯৩২ সালের ৯ই নভেম্বর। কেনাবেচা এখন মন্দা। ফণির দোকানেও বটে, গণেশের দোকানেও বটে। ফণি এসে গণেশের দোকানের সামনে বসেছে টুলের উপরে। সেইখান থেকেই

পুলিস পাহারাটি তখন খৈনি দলছিল রাস্তায় দাঁড়িয়ে। [ পৃষ্ঠা ৪০৯

নজর রাখছে দোকানের উপরে। এদিকে গল্পগাছা চলছে গণেশের সঙ্গে। কাজকারবার সম্পর্কেই। হঠাৎ গণেশের দোকানের দিকে এগিয়ে এল দুজন লোক। রাস্তা থেকেই এল। গণেশ তাদের দিকে ফিরল। "কী চাই স্যার?" প্রশ্নটা তার জিভের ডগায়। কিন্তু সে-প্রশ্ন সে উচ্চারণ করার সময় পেল কই? তার আগেই লোক দুইজন এসে দাঁড়িয়েছে ফণির পাশে। তাদের একজন বিদ্যুতের

বেগে একখানা ভোজালি বার করে ফেলেছে জামার ভিতর থেকে। আর তারই এক ঘা বসিয়ে দিয়েছে ফণির মাথায়। ফণির চিৎকার, গণেশের ঝাঁপিয়ে পড়া সেই আততায়ীর উপরে, এবং দ্বিতীয় আততায়ীর হাতেও ভোজালির আবির্ভাব, এবং গণেশের মাথায় সেই ভোজালি-পতন, এই সব কয়টি ঘটনাই ঘটে গেল প্রায় এক সঙ্গে, কয়েক সেকেণ্ডের ভিতরে।

পুলিস পাহারাটি তখন খৈনি দলছিল রাস্তায় দাঁড়িয়ে। সে কিছু টের পাওয়ার আগেই ঘটে গিয়েছে এ-সব। সে যাতে হঠাৎ টের না পায়, এই জন্যই বোধ হয় পিস্তল ব্যবহার না করে ভোজালির সাহায্য নিয়েছে আততায়ীরা।

যা হোক, পুলিসপুঙ্গব প্রথম সচেতন হল, ফণির ও গণেশের চিৎকারে। ফণি ত প্রথম আঘাতেই ধরাশায়ী হয়েছে। দুই শত্রুরই অখণ্ড মনোযোগ পড়েছে গণেশের উপরে। সব-সমেত তিনটি ঘা পড়েছে তার মাথায় দুই শত্রুর ভোজালি থেকে। কিন্তু কী কঠিন জান গণেশের! সেই অবস্থায় সে ধেয়ে চলেছে পলায়মান দুশমনদের পিছনে। নিজের মাথা থেকে পাগলাঝোরার জলের মত রক্তের ঝর্না ঝরছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

ততক্ষণে আশপাশের বহু লোক যোগ দিয়েছে আততায়ীদের পাশ্চাদ্ধাবনে। তারা দৌড়াচ্ছে রাস্তা ধরে। একটা ইলেকট্রিক থাম্বার গায়ে হেলান দেওয়া রয়েছে দু'খানা সাইকেল। অবশ্যই আততায়ীদের সাইকেল। আগে থাকতে এখানে রেখে গিয়েছে তারা।

আততায়ীরা এসে পড়েছে সাইকেলের কাছে।

কিন্তু পিছনের লোকেরাও এসে পড়েছে পিঠ-পিঠ। সাইকেলে ওঠার সময়ই তাদের ধরা পড়ার সম্ভাবনা। দুই আততায়ীতে নীচুগলায় কী যেন পরামর্শ হয়ে গেল। তারা সাইকেলের কাছে এল, কিন্তু উঠল না। ধাক্কা দিয়ে পথে ফেলে দিল গাড়ি দু'টো, যাতে অনুসরণকারীদের পথে তারা বাধার সৃষ্টি করতে পারে খানিকটা। ঐখানেই বাঁ দিকে একটা পোড়ো বাড়ি। রাস্তা ছেড়ে ওরা দু'জন নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল সেই বাড়ির ভিতরে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাদের পাত্তা পেলে না কেউ।

ফণি আর গণেশকে ওদিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দু'জনেই মারা গেল সেইখানে।

এদিকে পথে পড়ে আছে দু'খানা সাইকেল। একখানা সাইকেলে বাঁধা ছিল একটা কাপড়ের পুলিন্দা। পুলিস তার ভেতর পেল একখানা ধুতি আর একখানা ছোরা। ধুতিতে ধোবার চিহ্ন রয়েছে। সেই ধোবার চিহ্নের সূত্র ধরে ধরে পুলিস আবিষ্কার করল যে, ধুতির মালিক ৪ঠা ও ৫ই নভেম্বর দ্বারভাঙ্গা মেডিকেল স্কুলের বোর্ডিংয়ে অবস্থান করেছিল, সেখানকার এক মেডিকেল ছাত্রের অতিথি হিসাবে।

সেই ছাত্রের কাছ থেকেই তার অতিথিদের নাম জানতে পারল পুলিস। বৈকুণ্ঠ শুকুল ও শত্রুঘন মহতো। হাজিপুর গান্ধি আশ্রমের কর্মী ওরা। হাজিপুরে পুলিস খবর পেল যে, ওরা মজঃফরপুর সেবাদলের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট এবং মজঃফরপুরের পুলিস জানাল যে, বৈকুণ্ঠ শুকুল হচ্ছে ফেরারী আসামী। ফণি ঘোষের মত সেও ছিল হিন্দুস্থান গণতন্ত্রী বাহিনীর সৈনিক।

খোঁজাখুঁজির ফলে জানা গেল যে, মজঃফরপুর জেলার জালালপুর গ্রামে বৈকুণ্ঠর বাড়ি। সেখানে ১৯শে অক্টোবর সে গিয়েছিল একবার। ছিল দুদিন। দ্বিতীয় দিন কাপড়-জামা এক পুকুরের পাড়ে রেখে সে স্নান করতে নেমেছে, এমন সময়

পুলিস এসে উপস্থিত। পুলিস দেখে সে অন্য পাড়ে উঠে গা-ঢাকা দিল। পরিত্যক্ত জামার ভিতর পুলিস পেল একটা রিভলবার। তারপর থেকেই পুলিস রয়েছে তার পিছনে। তবু যে সে ওরই মধ্যে ফণি ঘোষকে খুন করার সুযোগ করে নিয়েছে, সে এক আশ্চর্য বাহাদুরি।

বৈকুণ্ঠ ধরা পড়ল অনেকদিন পরে, ১৯৩৩ সালের ৬ই জুলাই। শোনপুরের গণ্ডক সেতু পেরিয়ে যাচ্ছিল সে। পুলিস তাকে দেখামাত্রই চিনল এবং ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপরে। বৈকুণ্ঠর জামার পকেটে ছিল তাজা বোমা একটা, সেটা গেল ফেটে তৎক্ষণাৎ। কী জানি কেন, প্রাণহানি তাতে কারও হল না। কিন্তু পুলিসেরাও অল্প-বিস্তর আহত হল, বৈকুণ্ঠ নিজেও বাদ গেল না। ধরা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সে জয়ধ্বনি করে উঠল—"ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ! ভগৎ সিং কি জয়!"

বিচারে সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হল। তার ফাঁসি হয়ে গেল গয়া সেণ্ট্রাল জেলে, ১৯৩৪-এর ১৪ই মে। তার সাথী সেই শত্রুঘনের কোন সন্ধান পুলিস কোনদিন করতে পারেনি।

---

# বড় হলে ছোট হয়

**পূরবী দেবী**

আমেরিকার নিউ জার্সী প্রদেশে একটা বাড়িতে হঠাৎ বেশ চাঞ্চল্য দেখা গেল। বাড়িতে থাকে বাবা মা আর সাত বছরের একটি ছোট মেয়ে। অনেকক্ষণ ধরে খোঁজখবর নেবার পর মেয়ের মা দেখলেন, পাশের বাড়ির দরজা খুলে মেয়ে বেরিয়ে আসছে। তাই দেখে মেয়ের মা বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইলেন।

যে বাড়ি থেকে মেয়েটি বেরোল সে বাড়িতে তখন এক বিখ্যাত লোক বাস করতেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে প্রতিদিন বহু শিক্ষিত গণ্যমান্য লোক সেখানে আসতেন। পাড়া-প্রতিবেশীরা সে বাড়িটির দিকে যথাসম্ভব শ্রদ্ধা সহকারে চেয়ে দেখতো। মেয়েকে কাছে আসতে তার মা তাকে বললেন, হ্যাঁরে খুকী, তুই ও-বাড়িতে কেন গেছলি? কণ্ঠ তাঁর উদ্বেগ ভরা।

মেয়েটি চলা না থামিয়ে বললে—রোজই তো যাই।

মায়ের চোখ আরো বড় বড় হয়ে উঠল। কেন যাস?

অঙ্ক শিখতে। আমার বন্ধু রোজি বলেছে ও বাড়িতে যে বুড়ো লোকটা থাকে সে খুব ভাল লোক। আর খুব ভালো অঙ্ক বোঝাতে পারে। বুড়ো লোকটা আমায় কি বলেছে জান? বলেছে, অঙ্ক শক্ত মনে হলেই চলে আসবে।

এ্যাঁ করেছিস কি! দেখ আবার কি ফ্যাসাদ বাধালি!—এই বলে মা ছুটলেন পাশের বাড়িতে। বাড়ির কর্তা সেই বুড়োটার সঙ্গে দেখা হতে, মাফ চেয়ে মা বললেন, কিছু মনে করবেন না, আমার মেয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে আসে। আর যাতে না আসে আমি দেখব।

না না না, মোটেই তাকে বাধা দেবেন না। আমার কাছে অঙ্ক শিখে সে যত না উপকৃত হয়েছে তার চেয়ে আমি অনেক বেশী উপকৃত হয়েছি তার সঙ্গে কথা বলে।

মেয়েটার মা অবাক্ হয়ে গেল এই কথা শুনে।

যে লোকটিকে নিয়ে এই সমস্যা সেই লোকটি হলেন বিশ্ববিখ্যাত আইনস্টাইন। তিনি অত বড় হয়েছিলেন বলেই তাঁর কোন অহংকার ছিল না। তিনি ছোটদের সঙ্গে মিশেও জানবার জিনিস খুঁজে পেতেন।

---

# এক জন্মের কাহিনী

গোরাচাঁদ পাল

বুদ্ধদেব গৌতমরূপে জন্মগ্রহণ করার আগে নানারকম জীব ও মানুষরূপে জন্ম নিয়ে আমাদের জীবন-পথে চলার ভাল ভাল উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই সমস্ত জন্মের কাহিনীগুলো 'জাতকের গল্প' নামে পরিচিত হয়েছে।

একটি জন্মে ভগবান বুদ্ধদেব বলদ গরু হয়ে এসেছিলেন। সেই জন্মের কাহিনী আমি এখানে বর্ণনা করছি।

বারাণসীতে অর্থাৎ কাশীতে তখন ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর রাজত্বকালে এক গ্রামে এক গৃহস্থ বাস করত। সেই গৃহস্থের ছিল দুটি বলদ গরু। একটির নাম মহালোহিত আর অপরটির নাম চুল্ললোহিত।

ভগবান বুদ্ধদেব বলদ মহালোহিতরূপে জন্ম নিয়েছিলেন।

মহালোহিত অহিংস প্রকৃতির ছিল—মনে ছিল পরম শান্তি ও সুখ।

গৃহস্থের চাষবাস করার যে জমি ছিল তাতে ফসল ফলাবার জন্যে বলদ গরু দুটোকে লাঙল টানতে হত। বেলা পড়ে গেলে সূয্যিমামা পশ্চিম দিকে রাঙা আবির ছড়িয়ে যখন আমাদের কাছ থেকে দিন শেষে বিদায় নেওয়ার তোড়জোড় করত তখন মহালোহিত আর চুল্ললোহিত চাষের কাজ সেরে গৃহস্থবাড়ি ফিরে আসত।

সারাদিন লাঙল টেনে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে ক্লান্তি এলেও তারা গালগল্প করতে করতে গৃহস্থের দেওয়া ঘাস-বিচালি, আনাজের খোসা, ভাতের ফেন খেত, আর সময়মত ঘুমিয়ে পড়ত।

এই ভাবে গৃহস্থের বাড়িতে তাদের দিনগুলোকে কাটিয়ে যাচ্ছিল।

তাদের ভেতর মাঝে মধ্যে মতের অমিল হলেও

ভাব ভালবাসা ছিল খুব বেশী। একসঙ্গে কাজ করা, একসঙ্গে খাওয়া, একসঙ্গে থাকার জন্যে বোধহয় তাদের মধ্যে এরকম স্বভাবগত আন্তরিকতা বা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল।

একদিন গৃহস্থ একটি বাচ্চা ভেড়া কিনে নিয়ে এল। নতুন কেনা যে কোন জিনিস বা অন্য কিছু মানুষ আদরযত্ন করে। তাই স্বভাবতঃ বাচ্চা ভেড়াটা গৃহস্থের কাছে বেশ আদর পেতে লাগল।

গৃহস্থগিন্নী বলল, 'বাঃ, বেশ চমৎকার ভেড়ার বাচ্চাটা তো!'

গৃহস্থ বলল, 'হবে না! একটু বেশী দাম দিয়ে কিনেছি যে।'

গৃহস্থ ও গৃহস্থগিন্নী ভেড়ার বাচ্চাটা কিনে খুব খুশী। তাই তারা রোজ বাচ্চা ভেড়াটাকে কচি কচি দুর্বো ঘাস, ভাল পরিষ্কার দামি সরষের খোল, আটার ভূষি, চুনি, ছোলা এবং জলে গুলে গুড় খাওয়াতে লাগল।

বাচ্চা ভেড়াটা যত বড় হতে লাগল তার খাওয়ার খাদ্যের পরিমাণ বেড়ে গেল। তার আদর-যত্নও বেড়ে যেতে লাগল।

গৃহস্থ ও গৃহস্থগিন্নীর এরকম আদর-যত্নের বহর মহালোহিত আর চুল্ললোহিত দেখল।

তাই একদিন চুল্ললোহিত বলেই ফেলল, 'এত খাটা-খাটুনি, এত অক্লান্ত পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে গৃহস্থের চাষবাসের কাজ করছি, তবু আমাদের জন্যে ঘাস-বিচালি আর নামমাত্র শুকনো আনাজের খোসা! আর ভেড়াটার জন্যে কচি কচি দুব্বো ঘাস, ভাল কাবলি ছোলা মেশানো বিচালি, ভাত মেশানো ফেন আর সুন্দর টাটকা ফলের খোসা।'

মহালোহিত বলল, 'ভায়া, ঘাস-বিচালি আগে যেমন পেতে এখন তেমনি পাও। তবে কাবলি ছোলা পাও না, টাটকা ফলের খোসাও পাঁও না। কিন্তু খেতে তো পাও এবং তাতে পেটও ভরে—না খাইয়ে গৃহস্থ তোমাকে খাটিয়ে নিচ্ছে না।'

চুল্ললোহিত বলল, 'তা বটে, তবে গৃহস্থ ও গৃহস্থগিন্নীর ব্যবহারটা দেখছ তো! প্রাণপণ খেটে চাষবাসের কাজকর্ম করছি, তাদের অন্নের সংস্থানের ব্যবস্থা করছি। তা সত্ত্বেও ভেড়াটাকে বেশী আদর-যত্ন করছে। আমাদের অত আদর-যত্ন করেই না।'

মহালোহিত সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'যে যার নিজের ভাগ্যের ওপর আস্থা রেখে চল। পরের দিকে তাকিয়ে, পরের আদর-যত্নের কথা ভেবে নিজেকে অত ছোট কর না। গৃহস্থ ও গৃহস্থগিন্নী আমাদের চেয়ে ভেড়াটাকে সুখাদ্য খাওয়ানো ও আদর-যত্ন করা উচিত বলে মনে করছে। তাতে আমাদের হিংসা করা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়।'

আপত্তি তুলে চুল্ললোহিত বলল, 'সব সময় যীশুখ্রীষ্ট সেজে বসে থাকলে হয় না, বুঝেছো। চোখের সামনে এরকম অবিচার অন্যায় হবে, আমি কিছুতেই সহ্য করব না।'

মহালোহিত তবু ভালভাবে বোঝাবার চেষ্টা করল, বলল, 'যে সয় সে রয়। সহ্যের মূল্য অনেক বেশী। সহ্য করতে শেখ।'

সুন্দর আর দামী কথাগুলো চুল্ললোহিতের কিছুতেই ভাল লাগল না। সে বলল, 'তুমি শুধু কথায় কথায় বড় বড় উপদেশ দিয়ে বস। আমি কোন কথা শুনতে চাই না। কাল থেকে গৃহস্থের কাজে যাতে অনিষ্ট হয় তার চেষ্টা আমি করব।'

মহালোহিত তখন বলল, 'এরকম করলে বরং তুমি গৃহস্থের কাছে অনেক ছোট হয়ে যাবে।'

—'যে গৃহস্থের মন ছোট সেই গৃহস্থের বিরুদ্ধে যাওয়াই ভাল। আমি ঠিক মত কাজ করব না, কাজে গাফিলতি দেখাবই।'

গৃহস্থগিন্নী রোজ ভেড়াটার গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়।

—'দেখ চুল্ললোহিত, আমরা সামান্য জীব। কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ আমরা বুঝতে পারি না। তাই হঠাৎ কর্তব্যকাজ থেকে নিজেদের বিচ্যুত করা সঙ্গত নয়।'

কিন্তু চুল্ললোহিত বন্ধুর কোন উপদেশ, কোন পরামর্শ শুনল না। কর্তব্যকাজে ফাঁকি দিতে লাগল। গৃহস্থের অনিষ্ট সাধন করতে লাগল।

দিন চলে যায় বছর ঘুরে আসে।

একদিন চুল্ললোহিত দেখল গৃহস্থবাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হচ্ছে, সুন্দরভাবে সাজানো-গোছানো হচ্ছে, চুনকাম করা হচ্ছে, মেরাপ, সামিয়ানায় আর আলোর সমারোহে গৃহস্থবাড়ি ঝলমলিয়ে উঠল তারপর। গৃহস্থের আত্মীয়-স্বজন আসতে লাগল।

তখন চুল্ললোহিত কৌতূহলী হয়ে বলল, 'ভায়া কী ব্যাপার বল ত?'

মহালোহিত বলল, 'জান না, গৃহস্থের মেয়ের বিয়ে।'

চুল্ললোহিতের মনটা নেচে উঠল, বলল, 'ও তাই নাকি, সেইজন্যে গৃহস্থের কুটুম্বরা আসতে শুরু করছে। বেশ বেশ, তাহলে আমাদের খাওয়া-দাওয়া অনেক দিন পর ভালই হবে। তবে নিষ্কর্মা ভেড়াটার পোয়া বারো। রকমারি আনাজের ও ফলের খোসা খেয়ে খুব স্ফুর্তি মারবে।'

মহালোহিত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'তোমার শুধু ভেড়াটার ওপরই আক্রোশ।'

—'আক্রোশ আর রাগ বেড়ে গেল আমার। আমি কাজে অবহেলা, গাফিলতি করেও বদমাইশ অলসের বেহদ্দ ভেড়ার আদর-যত্ন এখনও কমাতে পারলুম না, বরং ওকে তো গৃহস্থগিন্নী রোজ গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, স্নান করিয়ে দিচ্ছে, সুন্দর সিমেন্টের জায়গাটাতে ঘুমোতে দিচ্ছে।'

—'তাহলে বুঝতে পারছ তোমার কাজেতে অবহেলা করলেও গৃহস্থের এতটুকু এসে যায় না।'

চুল্ললোহিত তবু বলল, 'নিষ্কর্মা ভেড়াটাকে দেখলে আমার গা পিত্তি জ্বলে যায়। শুধু খাচ্ছে-দাচ্ছে আর ঘুমাচ্ছে, আর তার ওপর আদর-যত্নের ঘটার চোটে তো আমি কপাল চাপড়ে মরছি। ভাবছি, এমন পাথর চাপা কপাল আমরাই করলাম।'

চুল্ললোহিতের কথাটা শুনে মহালোহিত বলল, 'এত মিছিমিছি আপসোস কর না। দেখ না শেষ পর্যন্ত কী হয়।'

কথাটা শুনে চুল্ললোহিত শুধু বলল, 'দেখেই যাব, ও ছাড়া আর আমাদের কিছুই করবার নেই।'

ভেড়াটাকে নিয়ে এইভাবে তাদের কথাবার্তা চলতে থাকে।

এরপর এল সেই বিয়ের দিন। গৃহস্থবাড়ি আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠল। সেই হৃষ্টপুষ্ট ভেড়াটাকে মেরে গৃহস্থ বিবাহের নিমন্ত্রিত অতিথিদের আপ্যায়ন করলেন।

ভেড়াটার মাংস খেয়ে একজন নিমন্ত্রিত অতিথি বললেন, 'ওহে, তোমার ভেড়ার মাংসের কালিয়াটা বেশ চমৎকার হয়েছে তো! কোথা থেকে ভেড়াটা যোগাড় করলে?'

গৃহস্থ বলল, 'একটা বাচ্চা ভেড়া কিনে পুষেছিলুম। আমার মেয়েটার বিয়েতে এটা কাটা হল। ভেড়াটাকে বেশ আদর-যত্ন করে মোটাসোটা করেছিলুম বলে তো মাংস এত সুস্বাদু হয়েছে।'

গৃহস্থ আর তার নিমন্ত্রিত অতিথির কথা শুনে চুল্ললোহিত অবাক্ হল।

মহালোহিত তখন বলল, 'মিছিমিছি ঈর্ষা আর হিংসেতে নিজেকে ভরিয়ে ফেলে কর্তব্যকাজে অবহেলা দেখালে তো?'

চুল্ললোহিত বলল, 'হ্যাঁ, আমার ভীষণ ভুল হয়েছে। আগে বুঝতে পারিনি, ভেড়াকে এভাবে কাজে লাগানো হবে। তার এই পরিণতি হবে জানলে আমি কাজে কখনই ফাঁকি দিতুম না।'

মহালোহিতরূপী বুদ্ধদেব তাই সেদিন বলে উঠলেন, 'আমরা সব কাজ ঠিকমত বুঝি না—বুঝতে পারি না বলে আমরা মিছিমিছি হৈ-হৈ করি, চেঁচামেচি করি দল পাকিয়ে কাণ্ড ঘটাই। স্বার্থের জন্যে মানুষ এরকম অনেক কিছু করে থাকে। তাই পরের ভাল দেখে, উন্নতির কথা শুনে হিংসা করতে নেই। পরের সৌভাগ্যে হিংসা না করে নিজের ভাগ্যে সন্তুষ্ট থেকে কর্তব্য-কাজ করে যাওয়াই প্রকৃত মনুষ্যত্বের লক্ষণ।'

মহালোহিতরূপী বুদ্ধদেব চুল্ললোহিতকে উপদেশ দিলেন এবং সেই সঙ্গে আমাদেরও বিশেষভাবে পরামর্শ দিলেন, বললেন, 'হে মনুষ্যসম্প্রদায়! তোমরা হিংসা কর না। হিংসাকে মন থেকে একেবারে বর্জন কর। হিংসা যেমন মনকে ছোট করে, তেমনি হিংসায় সারা দেহকে বিষিয়ে দেয়। সেই একটু একটু জমে থাকা হিংসে বিষের প্রভাবে দেহপাতও ঘটিয়ে থাকে। হিংসামুক্ত মন-প্রাণ-দেহে শান্তি আনে, অন্যকেও শান্তি দেয়—সুখ ও সমৃদ্ধির আলো দেখায়।'

---

## মজার খেলা

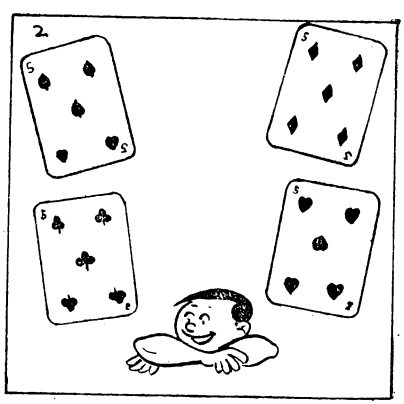

এক প্যাকেট তাস থেকে এই তাসগুলি নিয়ে এমন ভাবে সাজাতে হবে যাতে প্রতি তাসে চারিটি করে ফোঁটা দেখা যাবে। ( না পারলে ৪৩৪ পৃষ্ঠায় দেখ )

দিনকর শর্মা

"সময় থাকতেই পৌঁছে দেব স্যার! কিচ্ছু ভাববেন না। সূয্যি ডোবার আগেই পৌঁছে যাবেন আপনি। ঐ যে পাহাড়ের ওপারেই গাঁ-খানা! দেখতে পাচ্ছেন না? ঐ নীচু পাহাড়টা পেরুলেই, ব্যস। বলতে পারি যে এসেই পড়েছি একরকম।"

হাড়-জিরজিরে ঘোড়া দু'টোর পিঠের উপর দিয়ে সাঁই সাঁই শব্দে চাবুকখানা একটিবার ঘুরিয়ে এনে তারপর তাদের উদ্দেশে জোর গলায় হাঁকল তরুণ কোচোয়ান "ভেঈ-হে, ভেঈ মশাইরা—"

গেঁয়ো পথ, প্যাচপেচে কাদায় ভর্তি। গাড়িখানা হালকা, তাই তার চার চাকা কাদা ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে যাচ্ছে কোনরকমে। মাঠখানার এমনিতেই কোন বাহার নেই, তায় শেষ ডিসেম্বরের এই বৃষ্টিতে তার মাটি গিয়েছে একেবারে জবজবে হয়ে। আর তার দরুনই একটা বিশ্রী চেহারা দাঁড়িয়েছে গোটা অঞ্চলটার। গাড়ির নড়বড়ে কাঠামোটা আওয়াজই বা তুলছে কী রকম কর্কশ! সোনায় সোহাগা আর কি!

পাড়াগেঁয়ে ছোকরাটা আর একবার হাঁক দিল ঘোড়াদের লক্ষ্য করে, তারপর তার আসনে গুছিয়ে বসে ভিজে টুপিটাই টেনে দিল গলাবন্ধ পর্যন্ত, তারপর নিশ্চিন্দিভাবে গান ধরল গলা ছেড়ে।

একটি মোটা লোক বসেছিলেন গাড়ির ভিতরে। গায়ে তাঁর দামী কোট নেকড়ে বাঘের চামড়ার। তিনি এইবার জিজ্ঞাসা করলেন—"তোর নাম কী রে?"

ছেলেটা গানই গেয়ে চলেছে।

ভিতরের লোকটি গলা চড়িয়ে কর্কশ কণ্ঠে আবার বললেন—"এই ছোকরা!"

ঘাড় ফিরিয়ে ও বলল—"কী?"

"নাম! তোর নাম! কী নাম তোর?"

"ওন্দ্রা—"

"ওন্দ্রা! বটে! চালাক ছেলে তুই। শুধু তুই বা বলি কেন, সবাই তোরা চালাক বনে গিয়েছিস। ছিলি সব গেঁয়ো উজবুক, বনে গিয়েছিস তুখোড় ফন্দিবাজ। জানিস শুধু মিছে কথা কইতে আর মানুষ ঠকাতে। দেখছি ত! আদালতে

বসে বসে দু'চোখ মেলে দেখছি ত তোদের কাণ্ড-কারখানা। ভেক ধরবে যেন একেবারে নিরীহ মেষশাবক। আসলে কিন্তু প্রত্যেকে একটি ধাড়ী নেকড়ে। জজদেরও ঠকায়।"

"আমরা নেহাতই সাদাসিধে লোক স্যার। অকারণে আমাদের বদনাম রটায় মানুষে। আপনি যাই ভাবুন, ওরকম খারাপ আমরা নই। হ্যাঁ, ঠকায়! বোঝে না ত কিচ্ছু। এমন এমন কাজ করে বসে—আপনারা ভাবেন ঠকিয়েছে! আসলে ঠকাবার মতলবে ঠকায়নি। যা করেছে, কিছুই জানে না বোঝে না বলে করেছে। আর হয়ত, হয়ত, বড্ডো বেশী গরিব বলেই করেছে।"

"বাঃ বাঃ! চমৎকার বলেছিস! গরিব বলেই করেছে? অতি মাথা মোটা পাজী লোক সব। এদিকে বলবে কিচ্ছু জানি না, বড্ডো গরিব—ওদিকে মদ খাবে, মাছে যেমন জল খায় তেমনি। গরিব বলে করেছে? হেঃ হেঃ হেঃ—"

"গরিব বলে নয়? তবে কি মেলাই পয়সা আছে বলে? জনে জনে ধনকুবের হয়েছে বলেই লোক ঠকায় আর মিছে কথা বলে? হিঃ হিঃ হিঃ—মদ খাওয়া? তা খায়! দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলবার জন্য খায়। আপনি যা ভাবছেন, তা নয়। মদ খাওয়ার কারণ এটা নয় যে, দেদার সোনা দানা ওদের পকেটে আছে। এই কথাটা খাতায় লিখে রাখতে পারেন যে, দোষ যদি কিছু ওদের থাকে, তা গরিবির দোষ, বড়মানুষির দোষ নয়।"

"বাঃ ছোকরা, বাঃ! আমার ত মনে হচ্ছে, কোচবাক্সে বসবার আগে তুই নিজেও খেয়ে এসেছিস দুই এক বোতল। খেয়ে থাকলে অন্যায় করেছিস, বয়স তোর কম, এখনও গোঁফ গজায়নি তোর। এই তোদের চাষীগুলো, আসল কথা কি জানিস, এদের ইহ-পরকাল কোনটাই নেই। লিখে রাখ ওকথা, ইহ-পরকাল কোনটাই নেই।"

"লিখতে হয় ত আপনি লিখুন স্যার", বলল ওন্দ্রা—"আমরা কেউ লিখতে পড়তে জানিনে।" হাড়-জিরজিরে ঘোড়াদের দিকে তাকিয়ে সে আর একবার হাঁকল, "ভেঈ, মশাইরা, ভেঈ।" তারপর সে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল একেবারে।

ঘোড়া দু'টোও যেন চিন্তায় পড়েছে, নড়বে কি নড়বে না, এই চিন্তা।

গাড়ির ভিতরকার ভদ্রলোক তখন নেকড়ে-চামড়ার কোটে কলার উঁচু করে দিয়েছেন। মাথা নীচু করে ধ্যানস্থ হলেন তিনিও।

কাদায়-ডোবা পথের ধারে একটিমাত্র লম্বা গাছ। একটা ঝোড়ো কাক এসে বসল তার শুকনো ডালে। তার কা-কা আওয়াজ কত যেন দুঃখ আর নৈরাশ্যে ভরা। দুই চার বার ডেকে চিন্তায় ডুবে গেল সেও যেন। বিষণ্ণ হিমেল আবহাওয়াও যেন ধূসর আঙ্গরাখা গায়ে টেনে দিয়ে চিন্তায় মগ্ন। আকাশের পারাবারে পাল তুলে চলেছে খণ্ড ছিন্ন বিশীর্ণ মেঘের মালা। তাদের ফাঁকে ফাঁকে এক একবার চোখে পড়ে নিরুত্তাপ নীল শূন্য। কাদায় আর জলে তলিয়ে গিয়েছে সারা পৃথিবী। দৃষ্টির ভিতরে যেদিকে যত গ্রাম আছে, নদী বন পাহাড় নিকটে বা দূরে, সব অন্ধকারে ঢেকে আসছে একটু একটু করে। ওন্দ্রার চোখের সামনেই বিকৃত, বিবর্ণ, নির্জীব হয়ে আসছে সব। নীচের সমতলে মাঝে মাঝে ঝিকমিক করছে অগভীর প্রশস্ত জলা। তার জলের চেহারা মৃতের চোখের মত শীতল নিথর।

গভীর কাদা, তুলতুলে নরম। তার ভিতর দিয়ে ছোট্ট গাড়িখানা গড়াতে গড়াতে চলেছে। গড়াতে গড়াতে কাদাজলে ঢুকছে, গড়াতে গড়াতে বেরুচ্ছে তা থেকে আবার। মোড় ঘুরছে, পাক খাচ্ছে। এক পাশে একখানা তক্তা আলগা হয়ে গিয়েছে কেমন করে যেন। অনবরত তা ঘষা খাচ্ছে, নাড়ি খাচ্ছে, কখনো খড়খড় কখনো ঘটাং ঘটাং

আওয়াজ তুলে। অনবরত, একঘেয়ে, নিরর্থক, নিরানন্দ সে-আওয়াজ। ভিতরে বসে আছেন গরম-কোট-পরা মাননীয় ভদ্রলোকটি। তাঁর মন-মেজাজ খিঁচড়ে উঠছে সে-আওয়াজ শুনে শুনে। শেষ পর্যন্ত তিনি আর ধৈর্য রক্ষা করতে পারলেন না, কলারের ভাঁজ থেকে গলা উঁচিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিলেন ওন্দ্রার দিকে—"ঐ বিটকেল আওয়াজটা কিসের রে? মারা গেলাম ত!"

"একখানা আলগা তক্তা, স্যার"—বলল ওন্দ্রা—"শব্দ করে যাচ্ছে, যার মানে হয় না কিছু। অনেক পণ্ডিত লোকও ঐরকম করেন, বক্তৃতা দেন, মানে হয় না।"

"বাঃ, বাঃ, ওন্দ্রা, সত্যিই তুই চালাক, ভয়ানক চালাক।"

"মোটেই না স্যার। চালাক যে নই, তা এতেই বুঝতে পারবেন যে আপনার মত মস্ত লোক একজন আমাদের গাঁয়ে যাচ্ছেন কীজন্য, তা মোটেই আন্দাজে আসছে না আমার।"

"আমি হচ্ছি আদালতের নাজির।" জবাব এল রাজকীয় দম্ভের সুরে।

"সরকারী কাজেই যাচ্ছেন বোধ হয়?"

"অবিশ্যি! তোমাদেরই এক মাতব্বর এক হাত চালাকি খেলেছিল সেবার। বোঝ হে, আমার উপরেও চালাকি! তা এবার আমি খতম করে দিচ্ছি তাকে। কোর্টের পরোয়ানা নিয়ে এসেছি এবার, যাতে খতম করে দেওয়া যায়, এমনি পরোয়ানা। টেক্সো ফাঁকি দিচ্ছে হে! সন্ধ্যা-বেলায়ই খানাতল্লাশি করব। যাতে এবছরের বড়-দিনকে আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও তার মনে থাকে সারা জীবন, তাই করে ছাড়ব। গম, যব, রাই, যা কিছু ফসল তুলেছে, বাজেয়াপ্ত করব সব। দয়ামায়া তিলমাত্র করব না। মানে, শুধু ওকে শায়েস্তা করার প্রশ্ন এটা নয়, এ-তল্লাটের অতি-চালাক সবাইকে একটা শিক্ষা দিতে চাই আমরা। শিক্ষা দিতে চাই এইটি যে, সরকারের পাওনাগণ্ডা ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করলে তার ফল ভাল হবে না। ফাঁকি! ফাঁকি! চারিদিকে ফাঁকি দিচ্ছে এসব লোক। আড়তদারদের ফাঁকি দিচ্ছে, শহরবাসী-দের ফাঁকি দিচ্ছে, পচা ডিম আর টোকো মাখন খাওয়াচ্ছে তাদের। কিন্তু ঐখানেই থামতে হবে বাছাধনরা! কোর্টকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টাটা আর করো না। ও-চেষ্টা করলে সুবিধা হবে না। কোর্টের হাতে অস্ত্র আছে। সাজা দেবার ক্ষমতা কোর্টের আছে। তবে হ্যাঁ, খুব আফসোসের কথা, সে-ক্ষমতাও পর্যাপ্ত নয়। তোদের উচিত সাজা হল চাবুক। সেটা যখন তখন দিতে পারে না কোর্ট। দেশের আইন প্রশ্রয় দেয় তোদের বড্ডো। তা নইলে, পারতাম যদি উঠতে বসতে গিঁঠওয়ালা রুশ চাবুক তোদের পিঠে চালাতে, হ্যাঁ, সেই হত উচিত শিক্ষা তোদের।"

মোটা মানুষ, একটানা এতখানি তড়পানির ধকল সইবে কেন? হঠাৎ নাজির মশাই কাশতে শুরু করলেন বেদম। কোনরকমে সেটা সামলে নিয়ে আবার যখন বকতে শুরু করলেন, গলায় আর আগের মত জোর নেই। তবু খুক খুক কাশিকে অগ্রাহ্য করে ধরা গলায় যা তিনি বললেন —তার মর্ম হল এই যে গাঁয়ে গাঁয়ে চাষীরা হাড়-বজ্জাত হয়ে গিয়েছে। সবাই তারা মাতাল আজকাল, সবাই একান্ত অপদার্থ। টেক্সো দিচ্ছে না, অর্থাৎ সরকারের শিরদাঁড়াই ভেঙে দিতে চাইছে। অর্থের অভাবে দেশের কল্যাণের জন্য কোন কাজই হাতে নিতে পারছে না সরকার।

গলার জোর একটু একটু করে বাড়ছে আবার। কাশিটা থেমেছে, নাজির সাহেব আবার হাঁক ছাড়তে লাগলেন বাঘের মত—"হতে পারতাম যদি দুটো দিনের জন্য এদেশের জার, আমি নিজের

মতন করে নতুন রকম সাজা দিতাম তোদের। তোদের সবাইকে দেবতা বানিয়ে দিতাম ক্রুশে লটকে। হ্যাঁ বৎস, দেবতা একেবারে। খুব তোরা বেঁচে গিয়েছিস যে জার আমি নই।"

বকতে বকতে অত শীতেও দেহটা গরম হয়ে উঠেছে। নাজির সাহেব নেকড়ে-চামড়ার কোটের বোতাম খুলে দিলেন।

এত বক্তৃতা শোনার পরে, কী মুখখু ঐ ওন্‌দ্রাটা, এত বক্তৃতা শোনার পরে সে বিজ্ঞের মত মত প্রকাশ করল—"কিন্তু বিবেচনা করুন নাজির হুজুর, ভগবান ভালোর জন্যই সব করেন। দাড়ি গজালে মেয়েদের বিশ্রী দেখাত, তাই দাড়ি তিনি দেননি মেয়েদের। আবার কান দুটো লম্বা না হলে গাধাকে গাধা বলে চেনা যেত না। তাই প্রত্যেকটা গাধাকে তিনি দিয়েছেন লম্বা কান একজোড়া।"

হুজুর কি ওন্‌দ্রার এই সরল কথার ভিতরে কোন কদর্থের সন্ধান পেলেন? হয়ত বা তাই। তা না হলে হঠাৎ তিনি খেঁকিয়ে উঠলেন কেন?—"তোর বেকুফের মত কথা তুই থামা ত বাপু! তাড়াতাড়ি গাড়ি চালা। অন্ধকার হয়ে গেল, আমায় ত আবার বাড়ি ফিরতে হবে! কাল বড়-দিন না? বড়দিনের দিনটা ত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কাটাতে দিবি আমায়, নাকি? সারা বচ্ছর ত তোদের পিছনে হন্যে হয়ে ঘুরছি! কারও ফসল ক্রোক, কারও গরু ঘোড়া নীলাম, কারও বা ঘর-দরোজা ভেঙে উৎখাত একদম! কোন গাঁয়ে ভাল লোক ত একটাও নেই!"

এতক্ষণ বাদে আবার একটা কাশি এল খুক-খুক-খুক। সেটা সামলে নেবার পরে অন্য নালিশ শোনা গেল তাঁর মুখে—"তোরা ভাড়া বড় বেশী নিস বাপু! মাত্র বিশ কিলোমিটারের জন্য তিন তিনটি লিউ * ভাড়া? ওর চাইতে গা থেকে

—"খুব তোরা বেঁচে গিয়েছিস যে জার আমি নই।"

চামড়া খসিয়ে নে না বাপু! ওরে, তোর ঘোড়ারা ঘুমিয়ে পড়ল না কি?"

"ভেঈ, ভেঈ, মশাইরা, ভেঈ!" হাঁক দিল ওন্‌দ্রা, মশাইদের পিঠের উপর দিয়ে চাবুকটা সাঁই সাঁই শব্দে একবার ঘুরিয়ে এনে।

"ঘোড়াদের মশাই বলে নাকি কেউ?"—নাজির সাহেব ক্রুদ্ধ আবার। তাঁকেও বলছে মশাই, আবার ঘোড়াকেও বলছে মশাই? তাঁকে কি তাহলে প্রকারান্তরে চতুষ্পদ বলতে চায় ঐ শয়তানের বাচ্চা?—"সোজাসুজি ওদের ভাই বলে ডাক না!"

"তা ডাকলে ওরা রেগে যেতে পারে নাজির হুজুর! ওদের মশাই বলে ডাকাই দস্তুর। আপনি না জানতে পারেন, অনেক ভদ্রলোকের চেয়ে ওরা বেশী ভদ্দর। ওরাও 'অফিস' করে ভদ্দরদের

* লিউ হল বুলগেরিয়ার মুদ্রা

মত। রুটিন মাফিক কাজ করে ওরা। সকালে ওঠে, আমরা দানা দিই, পানি দিই ওদের। তারপর গাড়িতে জুড়ি, ওরা বেরিয়ে পড়ে, মানে অফিসে যায়। সন্ধ্যে পর্যন্ত খাটুনি। তারপর বাঁধা টাইমে রাত্রির খাবার। আমাদের কথাবার্তা খানিকটা শোনে, আপনাদের রেডিও শোনার মত, তারপর ঘুমিয়ে পড়ে। দস্তুরমত সরকারী হুজুরদের মত।"

"কোথাকার মদ তুই গিলিস, বল ত?"—রেগে উঠলেন নাজির—"বাজে কপচানি বন্ধ করে তাড়াতাড়ি গাড়ি চালিয়ে দে। দেরি হয়ে যাচ্ছে। খুবই দেরি হয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যের আগে পৌঁছে দিবি বলেছিলি না? কী ধাড়ী বজ্জাত যে তুই, তা ত আগে বুঝতে পারিনি! সন্ধ্যে করে ফেললি!"

"হোক না সন্ধ্যে হুজুর। নেকড়ে-টেকড়ে নেই এধারে"—বলল ওন্দ্রা।

যে-সুরে বলল, তাতে উক্তিটার উলটো অর্থ করে নিতে বাধ্য হলেন নাজির, ভয়ে ভয়ে তাকাতে লাগলেন এধার ওধার। কিন্তু মুখের ডম্ফাই তবু অটুট, বলছেন—"নেকড়েকে আবার ভয় করে কে? ভয় বরং করি ঠাণ্ডাকে। সর্দি-কাশি যদি হয়, এমন সময় নেই যে, বসে বসে চিকিৎসা করব তার।"

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। ওন্দ্রা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল—"সরকারী কাজে যাচ্ছেন, আমার উচিত আপনাকে খোঁজখবর দেওয়া। দেনদার লোকটা ফসল-টসল এর মধ্যেই হয়ত লুকিয়ে ফেলে থাকতে পারে। টেক্সো যখন দেয়নি, তার মনে ভয় ত আছেই একটা।"

নাজির উৎফুল্ল—"তা যা বলেছিস! এটা ত জানা কথাই যে আজ হোক কাল হোক, আমি একদিন আসবই! তা স্টেনাইকো যদি লুকিয়ে ফেলে থাকে আগে ভাগে, তুই পারিস জায়গাটা দেখিয়ে দিতে? যা বলেছিস, দেশের সব লোকেরই উচিত সরকারী কাজে সাহায্য করা। আমি তোর নাম লিখে দেব এত্তেলায়। হয়ত বখশিশ পেয়ে যাবি কিছু। লুকিয়েছে নাকি স্টেনাইকো?"

"নাঃ, তেমন কিছু শুনিনি। তবে চলুন ত, লুকিয়ে থাকলেও টেনে বার করে দেব। কিন্তু নাজির হুজুর, সব ফসলটাই নিয়ে নেবেন নাকি? স্টেনাইকো লোকটা, বুঝলেন হুজুর, বড্ডোই গরিব। টেক্সো দেয়নি, দিতে পারেনি বলেই। একবেলা আধপেটা খেতেই কুলোয় না। গম, যব কোথায়? চাট্টিখানি রাই পেয়েছে, সারা মরশুম তাতেই চালাতে হবে। কাচ্চাবাচ্চা গোটা পাঁচ-ছয়।"

"গরিব?"—তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠলেন— "গরিব ত সবাই। কিন্তু এ-লোকটা সাক্ষাৎ শয়তান। ঐ যে বলছিলাম, আমাকেও একবার ও ঘোল খাইয়েছিল—কিন্তু এবার"—এই পর্যন্ত বলেই চুপ মেরে গেলেন নাজির সাহেব। ওন্দ্রাও আর তাঁকে ঘাঁটানোর দরকার বুঝল না। নামটা জানা দরকার ছিল, তা সে জেনে নিয়েছে।

স্টেনাইকো গরিব, স্টেনাইকো লোক ভাল। ওন্দ্রাকে সে আপনজন বলেই বিবেচনা করে। এর পরে কিন্তু তা আর সে করবে না। আঙুল মটকে অভিশাপ দেবে—"ঐ ওন্দ্রাই নিজের গাড়িতে করে আমার যমকে বয়ে এনেছিল আমার দোরে।" ওন্দ্রা মুখ দেখাতে পারবে না গাঁয়ে।

অন্ধকার চারিধার। গাড়িটা পাহাড়ের উপরে উঠেছে কোনরকমে। এইবার নামতে হবে ওপিঠে। নামলেই গ্রাম পাওয়া যাবে। যে গ্রামে অল্প কিছু রাই মজুদ রয়েছে একটা কুঁড়ে ঘরের পিছনে। স্টেনাইকো আর তার পাঁচ ছয়টা কাচ্চা-বাচ্চার সারা মরশুমের মুখের গ্রাস।

গাড়ি একটা তেমাথায় পৌঁছাল, সমুখে দুটো পথ। বাঁয়েরটা সোজা পথ গাঁয়ের। ডাইনেরটা

গ্রামে যাওয়ারই পথ, তবে ঘুর-পথ। তা ছাড়া একটা জলা পেরিয়ে তবে গ্রামে পৌঁছোতে হয় সে-পথ ধরলে। জলা অনেকখানি চওড়া। জল এ-সময়ে সামান্যই থাকার কথা, কিন্তু হালে এই যে বৃষ্টিটা হয়ে গেল, তাতে বেড়েছে কিছু।

গাড়ির ভেতরে বসে নাজির চিল্লাচ্ছেন—"জলদি কর বজ্জাত, রাত হয়ে গেল যে! কখন কাজ সারব? কখন বাড়ি ফিরব? বাড়িতে ছেলেরা বড়দিনের গাছ সাজিয়ে বসে আছে যে!"

"এই যে হুজুর! পৌঁছে গেলাম বলে"—ওন্দ্রার মুখ থেকে কথা বেরুতে না বেরুতে গাড়ি গড়গড়িয়ে ডাইনের পথ ধরল। এখন গাড়ি বেশ জোর চলেছে। একে উতরাই পথ, তায় আবার শুকনো খটখটে।

হঠাৎ জলের শব্দ। জলের ভিতর দিয়ে চলেছে গাড়ি। তা নাজির তাতে মনে করলেন না কিছু, কত কত জলার ভিতর দিয়েই ত আসতে হয়েছে এমন!

কিন্তু এ কি! পায়ে জল লাগছে না? তাড়াতাড়ি পা আসনের উপরে টেনে তুলে নাজির ক্রুদ্ধ স্বরে বলে উঠলেন—"ওরে শয়তান। কত জলে এনে ফেললি? গাড়িতে জল উঠছে যে! এই শীতের রাতে ভিজিয়ে মারবি নাকি?"

সে-কথার জবাব ওন্দ্রার কাছে পাওয়া গেল না।

ভয়ানক একটা ঝাঁকুনি লাগল গাড়িতে। দুই দিক থেকে দুটো ঘোড়াই ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছে গাড়ি থেকে। যে দড়ি দিয়ে তারা বমের সঙ্গে বাঁধা ছিল, তা কখন যেন নিঃশব্দে খুলে দিয়েছে ওন্দ্রা।

এখন দুটো ঘোড়াই জল ভেঙে ডাঙার দিকে চলেছে, গাড়ি জলার ভিতর ফেলে রেখে। ওন্দ্রা? ওন্দ্রা কোথায়? সে নিজেও ঐ যে, ডাঙামুখো একটা ঘোড়ার পিঠে বসে আছে।

কথার জবাব না পেয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়েছিলেন নাজির, হঠাৎ এই দৃশ্য দেখে তিনি ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—"এ কী ওন্দ্রা? তুই কোথায় যাস ঘোড়া নিয়ে? আমায় এই জলার ভেতর ফেলে? লক্ষ্মী বাপ আমার, এমন কাজ কখনো করিস না। আমি দোষ করলাম কী? তিন লিউ কেন, দশ লিউ ভাড়া দেব তোকে—"

ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে ওন্দ্রা বলল—"দশ কেন, বিশ লিউ দিলেও এ-রাতে এই ঘোড়া মশাইরা আর গাড়ি টানবেন না। রাতটা আপনি গাড়িতে বসে আরাম করুন। কাল ভোরেই আমি ঘোড়া নিয়ে এসে গাড়ি গাঁয়ে পৌঁছে দেব। ভয় নেই, নেকড়ে-টেকড়ে সত্যিই নেই এদিকে। তবে হুঁশিয়ার, ঠাণ্ডা যেন না লাগে। নেকড়ে-চামড়ার কোটটাতে বোতামগুলো এঁটে দিন। সর্দি-কাশি হলে তার চিকিৎসার সময় যে আপনার নেই!"

"ওরে, কাল যে বড়দিন, বাড়িতে সবাই যে আমার আশায় বসে আছে! বিশ লিউ! পঞ্চাশ লিউ। আমি যাব না স্টেনাইকোর বাড়ি। আমায় নিজের বাড়ি পৌঁছে দে ওন্দ্রা!"

নাজিরের সে কান্নাভেজা আর্তনাদ ওন্দ্রার কানে পৌঁছল না। সে তখন ছুটে চলেছে স্টেনাইকোকে খবর দেওয়ার জন্য। রাতের মধ্যেই ফসল সরাতে হবে। যথেষ্ট সময় আছে। এই ত সবে সন্ধ্যা হল।

হ্যাঁ, সন্ধ্যা সবে হল এই। সারা দীর্ঘ শীতের রাত সমুখে পড়ে আছে। সারা রাত গাড়ির মধ্যে বসে জলার হিমশীতল হাওয়ায় হি-হি করে কাঁপুক নাজিরটা, গরিব মানুষকে যে মানুষ বিবেচনা করে না।*

* বুলগার কথাশিল্পী দিমিৎর আইভানভ-এর "দ্য কমিশনার্স ক্রিস্‌মাস" অবলম্বনে

দিলীপ দাস

পাঠশালা থেকে ফিরে গদাই। গাছ থেকে পেয়ারা খাচ্ছে।
গদাই, আর খেওনা বাবা
কেন মা?
আমি বারণ করছি না!
কেন বারণ করছ মা?
দেখেছ, ছেলে কি জেদী!
ভয় দেখিয়ে কিছু করতে পারবে না। না বোঝালে বশ করতে পারবে না।
গদাই, চান করতে যাবি?
বাইরে থেকে
যাব
মা, যাচ্ছি চান করতে
মেয়েদের ঘাটে। গদাই আর সব ছেলেরা –
যাঃ, পালা মেয়েদের ঘাটে ছেলেরা কেন

গদাই-এর বয়স ছয়। একদিন গদাই টেকোতে সুড়ি নিয়ে খেতে খেতে মাঠ দিয়ে যাচ্ছে। আকাশে মেঘের অপূর্ব দৃশ্য। মধ্য দিয়ে বক উড়ে যাচ্ছে। গদাই তা তন্ময় হয়ে দেখছে। হঠাৎ— ৮

গদাই অজ্ঞান হয়ে পড়ে

( ক্রমশঃ )

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

( ১১ )

মন্ত্রী কশ্যপ ঘোর সমস্যায় পড়েছেন কোনার-সুবার্ণে। ঘন ঘন ছুটে যাচ্ছেন গুরু মহানন্দ ভারতীর কাছে। তিনি শুধু বলছেন—"স্থৈর্য অবলম্বন কর। যথাকালে সব ঠিক হয়ে আসবে।" ভাষা অবশ্য গুরু, মন্ত্রী সকলেরই মুখে সংস্কৃত ঘেঁষা, পরিমার্জিত। এখানে তাকে কথ্য আকার দিয়ে পরিবেশন করা হচ্ছে পাঠকসমাজের সুবিধার জন্য।

"সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে"—প্রতিবারই মন্ত্রীকে আশ্বাস দিচ্ছেন রাজগুরু। মন্ত্রীর মাথায় কিছুতেই আসে না যে কী করে ঠিক হয়ে যাবে সব। ব্যাপার জটিল থেকে জটিলতর হয়ে আসছে। চরেরা সংবাদ আনছে, দুই দিক থেকে দুই রকম। এক চরের খবর, গজপত্তনের পথে দ্রুত এগিয়ে আসছে দু'টি যুবক, তাদের অধিকারে আছে আদিরাজা শশাঙ্কর অর্ধমুকুট। স্বচক্ষে দেখেছে চর। এক বৃক্ষতলে বসে যুবক দু'টি পুলিন্দা খুলে কাগজপত্র পরীক্ষা করছিল। চর সেই গাছের মোটা গুঁড়ি বেয়ে পিছন দিক দিয়ে উঠে বসেছিল উপরের ডালে। কাগজগুলি কিসের, সেইটি জানাই উদ্দেশ্য ছিল তার। কাগজ সে দেখেছিল কয়েকখানাই, সাদা রংয়ের আধুনিক কাগজ একতাড়া, তার সঙ্গে সাবেকী আমলের জিরজিরে হলদে কাগজ একখানা—

কিন্তু কাগজ চুলোয় যাক, যা দেখে চর বেচারী গাছের ডাল থেকে টাল খেয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়ার মত হয়েছিল, তা হল সেই অর্ধমুকুট। ঝলমল করছিল চোখ ধাঁধিয়ে। একটা ছেঁড়া কাপড়ে জড়ানোই ছিল অবশ্য, হঠাৎ বুঝি কেমন করে সে কাপড় সরে গিয়েছে মুকুটের উপর থেকে, ভাগ্যবান চরের চোখের সামনে প্রকাশ পেয়েছে সেই তেরো-শো বছরের স্বপ্নের বস্তু, যার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নওবাংয়ের ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হওয়ার কথা। মুকুট! শশাঙ্কমহারাজের অর্ধমুকুট! দেখে এসেছে চর। খবর দিয়েছে, সে-মুকুটের অধিকারীরা দ্রুতপদে এগিয়ে আসছে কোনার-সুবার্ণের দিকে। আশ্চর্য কথা, মহারণ্যের মাঝ-খানেও দিগভুল তাদের একবারও হচ্ছে না। কী

সব যন্ত্রপাতি আছে তাদের সঙ্গে, অভ্রান্তভাবেই দিকনির্ণয় করে নিচ্ছে তারা তাদেরই সাহায্যে।

মন্ত্রী প্রশ্ন করেছিলেন—"গজপত্তন! আমরা ও-অরণ্যের নাম দিয়েছিলাম গজপত্তন, সেই কোন্ আদি যুগে। গজ ওখানে হাজারে হাজারে, পুরাণে বর্ণিত অষ্ট দিগগজের মতই মহাকায় মহাগজ তারা প্রত্যেকে। তারাও কি নিরীহ বনে গিয়েছে ওদের সমুখে? বাধা দিচ্ছে না ওদের অগ্রগমনে? এমন ত আর আগে দেখা যায় নি কখনো! গজপত্তন বা বানরপত্তনের পথে এক পা এগুনোর সাধ্য কোনদিন ছিল না, বহিরাগত কারও পক্ষে।"

"সাধ্য এদেরও হত না, আগুনে-হাতিয়ার এদের হাতে না থাকলে" জবাব দিল চর—"দূরে দাঁড়িয়ে সেই অস্ত্র উঁচু করে ধরে, একটা দু'টো আওয়াজ তা থেকে হয়, এদিকে হাতীর দলে সব চেয়ে প্রকাণ্ড হাতীটা বসে পড়ে ধ্বসে-পড়া পাহাড়ের মত। তার হয়ত শুঁড় ফুটো হয়ে রক্ত গড়াচ্ছে, নয় ত পায়ের হাড় গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে কী যেন এক অদৃশ্য জিনিসের আঘাতে। হাতীরা মরতে ভয় পায় না। কিন্তু খোঁড়া হয়ে বেঁচে থাকা পছন্দ করে না তারা। আর শুঁড় ফুটো হলে ত শ্বাস নেওয়াই শক্ত!"

এসব বৃত্তান্তই যথাযথ গুরুপদে নিবেদন করেছেন মন্ত্রী, ফিরে এসেছেন সেই একই আশ্বাস নিয়ে—"আসতে দাও ওদের, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

এল তারা অবশেষে একদিন, বিশ্বজিৎ ওরফে সঞ্জয় আর চিদাম্বরম্ আপ্তে।

অনেক দূর থেকেই ওদের চোখে পড়ছিল, উত্তর দিকের উপর আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী একটা। এগিয়ে আসতেই মালুম হল, ও-ধোঁয়া বেরুচ্ছে একটা পাহাড়ের মাথা থেকে। আগ্নেয়গিরি? হ্যাঁ. 'আনএক্সপ্লোর্ড আফ্রিকা' বইয়ে একটা আগ্নেয়-গিরির উল্লেখ আছে বটে। একটা নাকি পাহাড় পাওয়া যাবে। তার আকার মিশরের পিরামিডের ধাঁচের। বারো মাস ত্রিশ দিন ধোঁয়া বেরুচ্ছে সেই পাহাড়ের শীর্ষ থেকে। মাঝে মাঝে আগুনের হলকাও। কিন্তু ক্ষতি কোনদিন নাকি সে-পাহাড় করে না কারও। হলকাই বেরোয়, কিন্তু আগুন বেরোয় না। লাভা ত নয়ই। কোনারসুবার্ণের পত্তনের পর এ-যাবৎ কোনদিন বেরোয় নি। হ্যাঁ, ঐ পিরামিড-পাহাড়ের নীচের উপত্যকাতেই সেই সমৃদ্ধ নগরীর অবস্থান। কোনারসুবার্ণ, নওবাং রাজ্যের রাজধানী। আসছে ওরা অরণ্যপথ বেয়ে। হ্যাঁ, অরণ্য নিবিড় হলেও এর বুক চিরে চিরে প্রশস্ত পথরেখাও এদিকে ওদিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এখন। লোকচলাচল হয় এদিকে। গৃহ-পালিত পশুর পদচিহ্নও পড়েছে সে-সব পথে। এমন কি, চাকার দাগও। গো-শকট? অশ্ববাহিত রথ? শশাঙ্কর সময়ে ত ভারতে রথের প্রচলন কমে এসেছিল! তবে তাঁর পরের যুগের বাঙ্গালীরা নতুন দেশে এসে কোন বিশেষ কারণে রথকেই যান হিসাবে যদি চালু করে থাকেন, অবাক্ হবার কী আছে তাতে?

হঠাৎই অরণ্য শেষ হয়ে গেল। ওদের সমুখে দেখা দিল বিস্তীর্ণ এক নদী। এই কি সেই নব-জাহ্নবী? নাবজান্‌বি এদেশের চলিত ভাষায়? নদীর বুকে ওকি জাহাজ নাকি? ছোট ছোট জাহাজ পাল তুলে চলেছে নদীর উজানে, আবার পঞ্চাশ ষাট খানা দাঁড় টেনে কোন কোনটা হয়ত চলেছে ভাটিতেও। বুঝতে কষ্ট হয় না, এই ধাঁচের জাহাজই আকারে বৃহৎ হলে অনায়াসে সমুদ্র পাড়ি দিতে পারে। এযুগে আর এদের সমুদ্রযাত্রার প্রয়োজন বা সুবিধা নেই বলেই হয়ত জলযানগুলির দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা আপনা থেকেই কমে এসেছে।

জাহাজ কম, জেলে ডিঙ্গি অনেক। সব ডিঙ্গিই যে মাছ ধরছে তা নয়, যাত্রী বহন করে উজানে বা ভাটিতে যাচ্ছেও অনেক নৌকা। হুবহু

সেই জিনিসের ঘটল প্রকাশ এই দুই বিদেশীর চোখে।

বাংলা দেশের নদীর ছবি। পাষণ্ড বিবেকহীন খুনে ঘাতক যাই হোক না বিশ্বজিৎ, হঠাৎ এই ছবি দেখে মনটা নরম হয়ে এল তার। ফেলে-আসা দেশের স্মৃতি আনমনা করে তুলল তাকে।

ঐ সেই কোনারসুবার্ণ। নরেন্দ্রাদিত্য শশাঙ্কর রাজধানী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কর্ণসুবর্ণের অনুকরণে গড়া। আকারে ছোট নয়, স্থাপত্যগৌরবে হীন নয়। মন্দিরচূড়া আকাশ স্পর্শ করেছে, প্রাসাদ-শীর্ষে পতাকা উড়ছে, তাতে আঁকা বাঙ্গালী-শৌর্যের চিরন্তন প্রতীক মহাব্যাঘ্র।

বৃহৎ এই রাজধানী শহরকে ধনুকের আকারে তিনদিকে ঘিরে রেখেছে এক মাঝারি উচ্চতার গিরিমালা, তারই মাঝের অংশটা হঠাৎ পিরামিডের আকার গ্রহণ করে ধোঁয়া ওগরাচ্ছে। কত কত যুগ ধরে—কে তা জানে।

বিশ্বজিৎ তাকিয়েই আছে সেই আগ্নেয়গিরির দিকে, হঠাৎ চিদাম্বরম্ তার হাত ধরে টানল—"দেখ, দেখ—"

একখানা নাতিবৃহৎ জাহাজ পাল গুটিয়ে নদীর মাঝবরাবর প্রায় স্থির হয়েই দাঁড়িয়েছিল অনেকক্ষণ ধরে। হঠাৎ সেটা অনুকূল হাওয়ায় উজানে চলতে শুরু করল পাল তুলে। আর তক্ষুণি সেই জিনিসটি, যাকে এতক্ষণ আড়াল করেছিল সেই জাহাজ—

সেই জিনিসের ঘটল প্রকাশ এই দুই বিদেশীর চোখে। এক অতিকায় শিলামূর্তির মাথা আর উত্তোলিত দুই বাহুর দশটি অঙ্গুলি। এক হাতে চক্র, এক হাতে শঙ্খ। বিষ্ণুমূর্তি! আনএক্সপ্লোর্ড আফ্রিকার বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে আর একখানা জলযান এসে বিশ্বজিৎদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে ফেলল সেই মূর্তিকে। সেও দাঁড়িয়ে রইল কিছুকাল। সব জলযানই কি এই মূর্তির কাছে এসে কিছুকাল দাঁড়ায় প্রণতি জানাবার জন্য? তাই হবে বোধ হয়। দাঁড়াবার অসুবিধা কিছু নেই। কারণ নদী চওড়া হলেও স্রোত খুবই মন্দা। গরমের দিন ত!

এরা দুজনে দাঁড়িয়েছিল একেবারে বনপ্রান্তে, এক বৃহৎ বনস্পতির আড়ালে। তাদের সমুখেই নদীর পাড় ঢালু হতে হতে ক্রমে জলে গিয়ে মিশেছে, অন্ততঃ বিশ ফুট ঢাল চিকচিক করছে সাদা শুকনো বালুতে। হঠাৎ সেই সাদা বালুর উপরে গজিয়ে উঠল এক সারি কালো মাথা। বিশ্বজিৎদের চমক কাটবার আগেই গোটা সাতেক কালো মাথার পিছনে আবির্ভাব ঘটেছে গোটা সাতেক তামাটে ধড়ের, দুখানা করে হাত এক একটা ধড়ে, কোন হাতই খালি নয়, এক হাতে একখানা তরোয়াল, আর এক হাতে একটা বল্লম।

ডুব সাঁতার কেটে এই সাতটা মানুষ কূলে এসে উঠেছে। অবশ্যই ওপার থেকে নগরবাসীরা লক্ষ্য করেছিল বিশ্বজিৎদের। কিন্তু কী করে লক্ষ্য করল? ওরা ত সারাক্ষণ গাছের আড়ালেই রয়েছে!

কিন্তু সে-গবেষণার সময় এ নয়। সাতটা মানুষ উঠে পড়েছে সৈকতে। বালির উপর দিয়ে হেঁটে আসছে যথাসম্ভব দ্রুত। দৌড়োনো যায় না বালুতে। সেইজন্যই হয়ত সে চেষ্টা করছে না। কিন্তু দৌড়োক বা হাঁটুক, মতলব ওদের ভাল নয় কখনোই। ভাল যদি হত, ডুবসাঁতার কেটে নদী পার হত না। সোজা ডিঙি বেয়েই আসত, বিদেশীদের নজর এড়াবার চেষ্টা না করে।

"কী করবে? পালাবে?"—জিজ্ঞাসা করছে চিদাম্বরম্।

"পালাবার জন্য কি এসেছি নাকি?"—সুস্পষ্ট ঘৃণা বিশ্বজিতের কথার সুরে।

"ওদের ভাবভঙ্গী ভাল নয় কিন্তু। বল্লম চালায় যদি?"

"তোমার উপর চালাতে পারে। কারণ তুমি বাংলা জানো না। তুমি একটু আড়ালে থাক, আমি ওদের বুঝিয়ে বলি সব কথা।"—এই বলেই বিশ্বজিৎ গাছের পিছন থেকে বেরিয়ে এল, বুক ফুলিয়ে হাঁটতে লাগল সেই সাতটা বল্লমধারীর দিকে। তারা তখন সৈকত পেরিয়ে উঁচু পাড়ের মাথায় উঠে পড়েছে। ওদের সঙ্গে বিশ্বজিতের ব্যবধান? দশ ফুটের বেশী নয় এখন।

সাতটা নওবাংবাসী হঠাৎ থেমে পড়ল সারি বেঁধে। বল্লম উঁচু করে ধরল কাঁধের উপরে। তরোয়াল তাদের কোমরে ঝুলছে।

ওভাবে বল্লম উঁচোনোর মানে একটাই হয়। ওরা থেমে পড়তে বলছে বিশ্বজিৎকে। জিজ্ঞাসাবাদ দূর থেকেই করতে চায় ওরা। কারণ—

নিজেরা ওরা সশস্ত্র, আগন্তুককে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় অস্ত্রহীন। কিন্তু বাইরের জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান ওদের অতি সামান্য হলেও, গুজব হিসাবে এটা অন্ততঃ ওদের শোনা আছে যে বহু বহু দূরের বিদেশগুলোতে সচরাচর এমন এমন অস্ত্র ব্যবহার করে মানুষে, যা হাতের মুঠোতে লুকিয়ে রাখা যায়, অথচ দরকার হলে চোখের পলকে যা থেকে প্রাণঘাতী আগুন বার করে পুড়িয়ে মারা যায় শত্রুকে, তা সে শত্রুর দেহের বল যতই বেশী হোক, বা বল্লম তরোয়াল যতই ধারালো হোক।

হ্যাঁ, ওরা বল্লম উঁচু করে ধরেছে। এক্ষুণি যেন ছুঁড়ে মারবে, এমনি ভঙ্গী। অর্থাৎ বিশ্বজিৎকে নিষেধ করছে আর এগুতে। বিশ্বজিৎ থামল।

বিশ্বজিৎ থামল। কলকাতার রঙ্গমঞ্চে আলমগীরকে যে ঢংয়ে দাঁড়াতে দেখেছিল কয়েক বছর আগে, সেই "অয়ম্ অহংভো" জাতীয় ঢংয়ে দুই পা ফাঁক করে দাঁড়াল বুক চিতিয়ে। সমুখের তামাটে মানুষ সাতটাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে স্পষ্ট বাংলা কথায় উচ্চারণ করল—"তোমরা কী করতে এসেছ? রাজাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য আসা উচিত ছিল মন্ত্রী সেনাপতি আর পৌর-প্রধানদের।"

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ সেই সাতটা মানুষ। বজ্রাহতের মত নিঃসাড়। তারপর কেউ একজন যেন আপন মনে আপনাকেই জিজ্ঞাসা করল—"রা-জা?" আর তার সেই স্বগত উক্তি শুনবার পরে দিশাহারা বাকী কয়জন যেন সম্বিত ফিরে পেলো আবার। একজন এক পা এগিয়ে এসে বাঁ-হাত নেড়ে অনর্গল বুকনি ছাড়তে লাগল কী যেন দুর্বোধ্য জবানে। সে-জবান যে শুদ্ধ বাংলার এক অতি-বিকৃত রন্ধ্র সংস্করণ, সেটা বিশ্বজিৎ আন্দাজ করে নিতে পারল শুধু এই কারণে যে গোটা পাঁচেক অবিকৃত বাংলা শব্দ লোকটার সেই ভাষণের মধ্যে উচ্চারিত হচ্ছিল খুবই ঘন ঘন। সেগুলি হল গৌড়, বঙ্গ, মগধ, রাজা, গুরু, মন্ত্রী!

বিশ্বজিৎ দেখল—এরা খাঁটি আধুনিক বাংলা

বিশ্বজিৎ দুই পা ফাঁক করে দাঁড়াল বুক চিতিয়ে। [ পৃষ্ঠা ৪২৭

ভাষার সঙ্গে আদৌ পরিচিত নয়। কাজেই সারাদিন চেষ্টা করলেও এদের সঙ্গে ভাব বিনিময় কতখানি সম্ভব হবে, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। অতএব বৃথা কালক্ষেপ না করে মোক্ষম দাওয়াই এক্ষুণি প্রয়োগ করা উচিত। সে কোটের ভিতর থেকে মুকুটের পুলিন্দাটি বার করল রাজকীয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে, আর উপরের ঢাকনা খুলে সেই সাতটা মানুষের ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখের সামনে তুলে ধরল—

সূর্যালোকে জাজ্বল্যমান সেই অর্ধমুকুট রাজা শশাঙ্কর!

অমনি যেন ম্যাজিক ঘটে গেল একটা। সাতটা লোক মাটিতে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে, তারপর ছয়টা গড়াগড়ি করতে লাগল ধুলোয়। বাকী একটা লোক ছুটে গেল নদীর কিনারে, শহরের দিকে মুখ করে গলা দিয়ে বার করল এক বিকট "কু-উ-ম্" আওয়াজ।

সঙ্গে সঙ্গে নদীবক্ষে একশোটা ছোট বড় জাহাজ বজরা ডিঙি থেকে হাজার লোক একসাথে গর্জে উঠল সেই একই "কু-উ-ম" নির্ঘোষে।

তারপর সে কী আনন্দ-কোলাহল! নগরে নদীবক্ষে মাটির বুকে আকাশের ঊর্ধ্বলোকে! শাঁখ বেজে উঠছে হাজারে হাজারে, ফানুস উড়ে যাচ্ছে কাতারে কাতারে, জগঝম্প, জয়ঢাক, করতাল, খোলের যোজন জোড়া ঐকতানে ওপারের শহর আর এপারের অরণ্য কম্পিত মথিত করে নওবাংবাসীরা হয়ে উঠল আনন্দে উন্মত্ত।

নদীবক্ষের বিষ্ণুমূর্তিকে ঘিরে ঘিরে যে বজরাখানা একবার এদিক একবার ওদিক আনাগোনা করছিল, তা এইবার সোজা এগিয়ে আসছে কূলের দিকে। আসতে আসতেই ত্বরিত-হস্তে সেরে নিচ্ছে নিজের প্রসাধন। দুই চার মাল্লা এসে সোনার বুটিতোলা লাল কাপড়ে ঢেকে দিল তার ছাদ আর দুই ধারের দেয়াল। খোলা পাটাতনের উপরে লাল গালিচা বিছিয়ে অন্যেরা তার উপরে এনে পেতে দিল এক গজদন্তের সুখাসন। মাস্তুলে কারা যেন উড়িয়ে দিল ব্যাঘ্রলাঞ্ছন জয়পতাকা।

বজরা এসে কূলে ভিড়ল। শুকনো বালির উপর দিয়ে উন্নতশিরে হেঁটে গেল বিশ্বজিৎ, উঠল গিয়ে বজরায়, রাজকীয় ভঙ্গিমায় উপবেশন করল সেই গজদন্তে গড়া আসনখানিতে। রণডঙ্কায় ঘা দিয়ে বজরা ছেড়ে দিল ওপারের দিকে। রাজ-বন্দনার কু-উ-ম ধ্বনি তখন তরঙ্গে তরঙ্গে আছড়ে

পড়ছে ওপারের শহরে, এপারের অরণ্যে, আর মাঝখানের নদীবক্ষে।

আর চিদাম্বরম্? তার অবস্থা কী তখন?

গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছিল সে এতক্ষণ। নিজের বোকামিকে দিচ্ছিল ধিক্কার। কেন সে বিশ্বজিৎকে একা যেতে দিল আগু বাড়িয়ে? বিশ্বজিৎ ওজর দেখিয়েছিল—"তুমি বাংলা জানো না।" বিশ্বজিতের নিজের বাংলাই বা কোন্ কাজে এলো সময়কালে? তার দীর্ঘ বক্তৃতার ভিতরে তামাটে লোকগুলোর ত বোধগম্য হয়েছিল মাত্র একটি শব্দ—'রাজা'। কাজ যা হবার, তা ত হল ঐ মুকুটের টুকরোটা তাদের নাকের ডগায় উঁচু করে ধরার দরুন! এ-অবস্থায় চিদাম্বরম্ও বিশ্বজিতের পাশে হাজির থাকলে লোকসানটা হত কী?

না, লোকসান ত হতই না। চিদাম্বরম্ও ঐ জয়যাত্রার মিছিলে সমান সম্মানের ভাগী হতে পারত বিশ্বজিতের সঙ্গে। একখানা চেয়ার পেতেছে ওরা বজরায়, সেক্ষেত্রে দুখানা পেতে দিত নিঃশব্দে। ওরা নীচু স্তরের সৈনিক, দুটো আগন্তুকের মধ্যে মুকুটের অধিকারী সত্যি সত্যি কোন্‌টি, তার বিচার করতে ওরা বসত না নিশ্চয়ই, দুজনকেই নিয়ে যেত সমান খাতির করে কর্তাব্যক্তিদের কাছে। এঃ—চরম বোকামিই হয়ে গেল বটে! সে না কূটনীতি দপ্তরের লোক? কোনও কূটনীতিজ্ঞ লোক কি কখনও এমন করে নিজের পায়ে কুড়োল মারে?

এখন? চিদাম্বরমের করণীয় কী এখন? বজরা ওপারে পৌঁছোলো ঐ। নদী খুবই চওড়া বটে, তবু প্রখর দিবালোকে এপার থেকেও দেখা যায় যে ওপারে কী হচ্ছে। ঐ বজরা ভিড়ল। একটা জেটির মতন বাঁধ। তার উপরে সারি দিয়ে দাঁড়ালো অনেকগুলি সুবেশ পুরুষ। অনেকটা বাঙালী বাবুদের মতন পোশাক-আশাক। তফাৎ এইটুকু মাত্র যে এদের ধুতি হাঁটুর নীচে নামে না, আর গায়ের আঁটো জামার হাতাও কনুইয়ে পৌঁছে খতম হয়ে যায়।

বিশ্বজিৎ আসন ছেড়ে ওঠে নি। বসে বসেই অর্ধমুকুট তুলে ধরেছে ঐ লোকগুলির সমুখে। এক দাড়িওয়ালা বুড়ো হাতে নিয়েও দেখলেন সেটা। তারপরে আবার আকাশ-ফাটানো কুম্ শব্দ শত শত কণ্ঠে, আবার শত শত শঙ্খের নিঃস্বন এক সাথে—

যাক, এইবার একখানা নৌকা ওপার থেকে এপারের দিকে আসছে। না, বেইমানি করবে না বিশ্বজিৎ ওরফে সঞ্জয় সিকদার, অংশীদারকে দেবে না ফাঁকি। চিদাম্বরমকে নিয়ে যাবার জন্যই পাঠাচ্ছে নৌকা। সিংহাসন নেই বটে এ-নৌকার পাটাতনে, মাস্তুলেও উড়ছে না বাঘ-পতাকা। যাক, তা নিয়ে ঝগড়া পরে করলেও চলবে বিশ্বজিতের সঙ্গে। আগে ওপারে গিয়ে পৌঁছোনো যাক ত!

নৌকোটা ভিড়ছে এপারে। চিদাম্বরম্ আর অপেক্ষা করল না। বিশ্বজিৎকে যে রাজকীয় ভঙ্গীতে হাঁটতে দেখেছিল একটু আগে, তারই অনুকরণে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে গেল তামাটে লোকগুলির সামনে।

চিদাম্বরম্ দাঁড়িয়েছে পাড়ের কিনারা ঘেঁষে, লোকগুলি তখনো বালুবেলার মাঝামাঝি। নৌকার পাটাতনে আরও কয়েকটা লোক রয়েছে। তাদের একজনের হাতে একগাছা সরু দড়ি। হঠাৎ সেই দড়ি মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে তার এক প্রান্ত সে তীরবেগে ছুঁড়ে মারল কূলের দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে, কী যে হচ্ছে তার কোন ধারণা মাথায় ঢুকবার আগেই চিদাম্বরম্ উপলব্ধি করল যে সেই দড়িগাছটা ঠিক জালের মত পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলেছে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে।

( ক্রমশঃ )

# ভূতদেখা

রণজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

ছোটবেলায় ঠাকুমা দিদিমার কাছে ভূতের গল্প শুনতাম। অমুক গ্রামে অমুক লোককে ভূতে ধরেছিল। ভূতের নানারকম কার্যকলাপের গল্প শুনে শুনে ভূত সম্বন্ধে এক অদম্য কৌতুহল আমাকে সব সময় খোঁচাতো। প্রায়ই শুয়ে শুয়ে ভাবতাম ভূত দেখতে কেমন? ছবিতে যে ভূত দেখি সেই রকম? না অন্য কিছু।

যেখানকার কথা বলছি সে গ্রামের নাম কুষ্ঠিয়া। আগে পূর্ব পাকিস্তান ছিল এখন বাংলাদেশ। ক্লাস নাইনে পড়ি। দূর গ্রাম থেকে অনেক ছেলেরা আমাদের স্কুলে পড়তে আসতো। ওদের অনেককেই ভূত সম্বন্ধে আমি অনেক প্রশ্ন করেছি, কিন্তু ওদের কথাও সেই ঠাকুমার মুখে গল্প শোনার মতো। কেউ নিজের চোখে দেখেনি।

পরীক্ষা এসে গেছে। আমি কাঞ্চন আর তরুণ একসাথে পড়াশুনা করি। কাঞ্চন আর তরুণ আমার দুই বন্ধু। একদিন সন্ধ্যেবেলা কি একটা ব্যাপারে বাংলা তারিখ জানবার দরকার হল। তরুণ গেল বাংলা ক্যালেণ্ডার দেখতে। ফিরে এসে বলল—আজ অমাবস্যা এবং পুস্কর তিথি। আমি আর কাঞ্চন হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। কেননা তিথি নক্ষত্রের ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না। তরুণের পুস্কর তিথি বিশেষ-ভাবে বলার মধ্যে যেন একটা রহস্য আছে। আমি বললাম—পুস্কর তিথি তো কি হয়েছে? তরুণ বিজ্ঞের মতো গম্ভীর হয়ে জবাব দিল—জানো না তো এই তিথিতে শ্মশানে গোরস্থানে সব ভূত-পেত্নীরা ঘুরে বেড়ায়।

কাঞ্চন ফস করে বলে উঠলো—কেন ঐ দিন কি ওদের সরস্বতী পুজো?

আমি হেসে উঠি। কাঞ্চনকে থামিয়ে তরুণকে জিজ্ঞাসা করি—ঘুরে বেড়ায় মানে কি? কি করে ওরা?

তরুণ বলল—অত জানি না। আমি যখন

ক্যালেণ্ডার দেখছিলাম তখন বিশুকাকা ওখানে বসেছিল। বিশুকাকাই আমাকে পুস্কর তিথির কথা বলল। আমি আর কথা না বাড়িয়ে সোজা বিশুকাকার কাছে চলে গেলাম। বিশুকাকার সম্বন্ধে একটু বলে রাখি। বিশুকাকা এমন একটি লোক যার অনেক রকম অভিজ্ঞতা আছে। কোথাও কেউ মারা গেলে বিশুকাকা হাজির। মড়া পোড়ানোয় বিশুকাকার জুড়ি নেই। কাউকে সাপে কামড়ালে আগে বিশুকাকার খোঁজ পড়ে। ওঝা ডাকা থেকে আরম্ভ করে বিশেষ বিশেষ গাছ-গাছড়া সব বিশুকাকা যোগাড় করে আনবে। এ হেন বিশুকাকা যখন বলেছে, তখন নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যাপার আছে। পুস্কর তিথি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতেই বিশুকাকা বলল—ওরে বাবা ওই তিথিতে কোন গ্রামে যদি কেউ মরে, তবে সেই গ্রামে মড়ক লাগে। অর্থাৎ সবাই মরে যায়। শুধু তাই নয় ঐ তিথিতে মরলে আত্মার সদ্‌গতি হয় না। সব ভূত হয়ে যায়। তাছাড়া শ্মশানে বা গোরস্থানে লোকে বিভীষিকা দেখে। আজ আবার পুস্কর তিথির সাথে অমাবস্যা। আজ সব অশরীরী আত্মারা বেরিয়ে আসবে।

আমি মন দিয়ে সব শুনলাম। আগেই বলেছি ভূত দেখার প্রবল ইচ্ছে আমার মনে ছিল। ভাবতে আরম্ভ করলাম কি করা যায়। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। খেলতে বেরিয়ে তরুণ আর কাঞ্চনকে বললাম,—আজ রাত্তিরে আমি শ্মশানে যাবো।

ওরা তো শুনেই হাঁ। বলল—কিছুতেই যেতে পারবি না।

আমারও জিদ চেপে গেল। বললাম—আমি যাবই।

ওরা বলল—বাজি ?

আমি বললাম—কি বাজি ?

—যদি তুই শ্মশানে গিয়ে তোর নাম লিখে রেখে আসতে পারিস তবে এক সের রসোগোল্লা খাওয়াবো। কিন্তু তোমাকে আমরা চক ( খড়ি ) দেব। সেই চক দিয়ে লিখতে হবে।

একে এক সের রসোগোল্লার লোভ অন্যদিকে ভূত দেখার আগ্রহ। আমি বাজিতে রাজি হয়ে গেলাম। ওরা বলল—কিন্তু তোর যদি কিছু হয় ?

—আমার কিছু হবে না। শুধু সাপের হাত থেকে বাঁচবার জন্য আমি একটা লাঠি এবং একটা টর্চ লাইট রাখতে চাই।

—ঠিক আছে তাই হবে। কাঞ্চন বলে।

সন্ধ্যের পর ওরা আমাকে একটা হলুদ রঙের চক দিল। আমি বাড়ি ফিরে এলাম। হাত পা ধুয়ে পড়তে বসলাম। কিন্তু পড়ায় মন বসছে না। শুধু ভাবছি কখন রাত হবে। কখন শ্মশানে যাব। পড়া শেষ হল। আমি চুপি চুপি দাদার ঘর থেকে টর্চটা নিয়ে এলাম। খুঁজে-পেতে একটা লাঠিও যোগাড় করলাম। এখন বেরোলেই হয়। শুধু একটা ব্যাপারে মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। আমি বেরিয়ে গেলে দরজা খোলা থাকবে। চোর ঢোকার ভয় আছে। অথচ বাড়িতে কাউকে জানালে শ্মশানে যাওয়া তো হবেই না উপরন্তু বাবা শুনলে পেটাতে আরম্ভ করবেন। অথচ আমাকে যেতেই হবে। নইলে এক সের রসগোল্লা হারতে হবে। সেই সঙ্গে তরুণ আর কাঞ্চন ক্ষেপাবে। কি করা যায় ? হঠাৎ একটা প্ল্যান মাথায় এলো। ছোট বোন রুবীকে ডেকে আস্তে আস্তে সব বললাম। আরও বললাম আমি বেরিয়ে যাবার পর তুই শুধু দরজাটা বন্ধ করে দিবি। ব্যাস্ কাল সকালে এক সের রসোগোল্লা জিতলে তুইও ভাগ পাবি। শ্মশানে যাবার কথা শুনেই রুবী কান্না কান্না গলায় বলল—মেজদা তোর যদি কিছু হয় ?

—দূর বোকা কিচ্ছু হবে না। সঙ্গে লাঠি আর টর্চ থাকছে। আমি বললাম।

রাত তখন দুটো। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠলাম। সমস্ত বাড়িটা অন্ধকার। পাশের ঘরে মায়ের সাথে রুবী শোয়। জানালার দিকে মাথা দিয়ে শোয়ায় আমি জানালায় টোকা মারলাম। রুবী জেগেই ছিল। সারাদিন সংসারের কাজ করে মা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। রুবী উঠে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। আমি বেরিয়ে পড়লাম। শ্মশান আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় দু মাইল দূরে। গড়াই নদীর পাশে। সমস্ত পাড়াটা নিস্তব্ধ। দু একটা কুকুর রাস্তায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। আমি নিঝুম রাস্তা ধরে চলছি। আধ মাইল রাস্তায় কোন অসুবিধা নেই। তারপর রেল লাইন। রেল লাইন পেরোলেই শ্মশানের পথ।

রেল লাইন পার হয়ে একটু দাঁড়ালাম। সামনে জমাট অন্ধকার। হাতের টর্চ লাইটটা একবার জ্বাললাম। মেঠো পথটা এঁকে বেঁকে শ্মশানের দিকে চলে গেছে। সবে এক পা বাড়িয়েছি, হঠাৎ বিকট শব্দে একটা শেয়াল ডেকে উঠলো। দারুণ চমকে উঠলাম। গা ছমছম করে উঠলো। রেল লাইন থেকে কয়েকটা পাথর কুড়িয়ে পকেটে পুরে নিলাম। বগলে লাঠি, হাতে টর্চ এবং পাথর রাখা পকেটে হাতটা ঢুকিয়ে আমি শ্মশানের উদ্দেশ্যে চলতে লাগলাম। মনে মনে কিরীটি রায়ের দুর্ধর্ষ অভিযানের কথা স্মরণ করে সাহস আনবার চেষ্টা করলাম। যে কোন রহস্যভেদ করতে গেলেই সাহস থাকা দরকার। নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত। রাস্তার পাশে ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাকে পরিবেশটা কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে একটা কিছু ঘটে যেতে পারে। ঠিক সেই সময় গভীর রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে মাথার ওপর দিয়ে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজ তুলে একটা পেঁচা উড়ে গেল। আমি ভয়ে প্রায় বসে পড়েছি। পকেটে হাতের মুঠোয় একটা পাথর শক্ত করে ধরা। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। লাঠি আর টর্চটা সামনে বাগিয়ে ধরে একবার পেছনে তাকালাম। দূরে সিগন্যালের লাল আলোটা একটা ভূতের চোখের মতো লাগছে। আবার সামনে এগিয়ে চলি। খানিকক্ষণ চলার পর মনে হল কে যেন আমার পেছন পেছন আসছে। আমি স্পষ্ট পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। হঠাৎ পেছন ফিরে আলো জ্বেলে দেখি কেউ নেই। তবে কি কোন অশরীরী আত্মা আমার পিছু নিয়েছে? বিশু কাকার কথা মনে পড়লো, ওই তিথিতে শ্মশানে বা গোরস্থানে লোকে বিভীষিকা দেখে। তৎক্ষণাৎ মায়ের কথা ভাবলাম। মা বলে ভয় পেলে রাম নাম স্মরণ করতে হয়। আমি মনে মনে আওড়াতে লাগলাম ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি, রাম-লক্ষ্মণ সাথে আছে করবি আমার কি?

অনেকটা পথ চলে এসেছি। বাকী পথটুকু নদীর ধার ঘেঁষে চলতে হবে। নদীর বুকেও কিছু দেখা যাচ্ছে না। চাপ চাপ জমাট অন্ধকার। হঠাৎ মনে হল অনেক দূর থেকে কে যেন আমার নাম ধরে ডাকলো বা—পী—। আবার দাঁড়িয়ে পড়লাম। শুনেছি ভূতেরা অনেক সময় নিশি ডাকে। ও ডাকে কখনও সাড়া দিতে নেই। পেছনে তাকালাম না। বুকের মধ্যে ধুক-ধুক শব্দ যেন নিজেই শুনতে পাচ্ছি। পা দুটো ভীষণ ভারী মনে হচ্ছে। গলাটাও শুকিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে শিউরে উঠছি আবার মনে মনে আওড়াচ্ছি ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি, রাম-লক্ষ্মণ সাথে আছে করবি আমার কি?

একটু জল পেলে ভাল হত। কিন্তু কাছাকাছি কোন লোকালয় নেই। অন্ধকারে নদীর জল খাওয়াও সমীচীন হবে না। হঠাৎ দৃষ্টিটা নদীর

দিকে পড়তেই দেখি দুটো জ্বলজ্বলে চোখ আস্তে আস্তে আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। প্রথমে ভাবলাম ও কিছু নয়। কয়েক পা এগিয়ে গেলাম সামনের দিকে। কে যেন জোর করে আমার মুখখানা নদীর দিকে ঘুরিয়ে দিল। স্থির দৃষ্টিতে চোখ দুটো আমার দিকে চেয়ে আছে। ক্রমশঃ এগিয়েও আসছে। ছুটে পালাবো না চিৎকার করবো ভাবছি। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল এক মাইলের মধ্যে কোন লোকালয় নেই। সুতরাং চিৎকার করা বৃথা। বরং তাতে অশরীরী বুঝতে পারবে আমি ভয় পেয়েছি। পৈতে বার করে জোরে জোরে গায়ত্রী জপ করতে লাগলাম।

চোখ দুটো আরও এগিয়ে আসছে। আমি কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছি। হাত পা অবশ। চলার শক্তি নেই। ভয়ে কাঁপতে আরম্ভ করেছি। হাতের লাঠি আর টর্চ প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। বহু কষ্টে বুকের সাথে চেপে ধরে রাখলাম। একবার ভাবলাম টর্চটা জ্বালি, আবার ভাবলাম নিশ্চয়ই স্কন্ধকাটা। বুকের ওপর দুটো চোখ, বিশাল হাত সামনে বাড়ানো। ওরা শূন্যে এবং জলের ওপর স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারে। আলো জ্বাললে নির্ঘাৎ আমার অস্তিত্ব জেনে যাবে এবং যে কোন রকম বিপদ ঘটতে পারে। কিন্তু ও দুটো যেভাবে এগোচ্ছে তাতে আর দু মিনিটের মধ্যেই আমার কাছাকাছি চলে আসবে। মনে সাহস সঞ্চয় করে টর্চটা জ্বালতে যাবো এমন সময় ছপাৎ ছপাৎ শব্দ কানে এলো। টর্চের বোতাম টিপতেই দেখি ঘন অন্ধকারে পাড়ের কাছাকাছি একটা নৌকো। জানালার দুই ছিদ্রপথে ভেতরের ছিটকে আসা আলোকেই এতক্ষণ ভূতের চোখ বলে মনে হচ্ছিল। হাওয়া বইছে আমার দিক থেকে নদীর দিকে, তাই এতক্ষণ দাঁড়ের আওয়াজ শুনতে পাইনি।

প্রাণ ফিরে পেলাম। আবার চলতে লাগলাম

—কে আছো বেরিয়ে এসো, নইলে আমি ইঁট ছুঁড়তে থাকবো। [ পৃষ্ঠা ৪৩৪

শ্মশানের দিকে। খানিকটা এগোচ্ছি আর পেছন ফিরে নৌকোর আলোটা দেখার চেষ্টা করছি। এতক্ষণ যা ভয়ের ব্যাপার ছিল, এখন যেন সেটাই খানিকটা ভরসা বলে মনে হচ্ছে। মনকে সান্ত্বনা দিলাম এত ভয় পেলে ভূতের মুখোমুখি হবো কি করে? হঠাৎ যেন আমার সাহস বেড়ে গেল। বড় বড় পা ফেলে শ্মশানের দিকে এগোতে লাগলাম। ঐ তো আর কিছুটা গেলেই শ্মশান।

শ্মশানে দুর্গাপূজা হয়। বন্ধুদের সাথে এসেছিলাম ঠাকুর দেখতে। তাও দিনের বেলা। সামনের বিরাট

বিরাট ঝুড়িওলা বটগাছটাই যেন ভয়াবহ। শ্মশানের কাছে এসে গেছি। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। টর্চ জ্বাললাম। সরু পায়ে চলা পথ। এপাশে ওপাশে আলোটা ঘোরাতেই দেখি ডানদিকে একটা মড়ার মাথার খুলি। মনে মনে গায়ত্রী জপ করতে করতে এগোই। কিছুটা এগোতে পারলেই শবযাত্রীদের বিশ্রাম নেবার বাঁধানো চত্বর। আলোটা তুলতেই মনে হল একটা ছায়ার মতো কি যেন পাশে বেত-বনের আড়ালে চলে গেল। ভয়ে গায়ের রোমগুলো সব খাড়া হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে ভীষণ শীত করছে। দাঁড়িয়ে পড়লাম। আশে পাশে পেছনে একবার ভাল করে দেখে নিলাম। না, কোন জন-প্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। ভাবছি কেনই বা বাজি ধরতে গেলাম।

যাই হোক এতখানি যখন এসেই পড়েছি তখন নাম না লিখে যাবার কোন মানে হয় না। ঝটপট ঝটপট আওয়াজ তুলে একটা বাদুড় উড়ে গেল। ভয়ে আমার কান্না পাচ্ছে। শুনেছি ভয় পেলেও মুখে তা প্রকাশ করতে নেই। মনে মনে বলি ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি, রাম-লক্ষ্মণ সাথে আছে করবি আমার কি? সামনেই শবযাত্রী চটি, অথচ এগোতে পারছি না। মনে হচ্ছে ওখানে একটা ভীষণ বিপদ আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু নামটা যে ওখানেই লিখতে হবে। কি করি? আশে পাশে কয়েকখানা ইঁট পড়ে আছে। জয় রাম বলে যেই পা বাড়িয়েছি অমনি একটা নাকী সুরের আওয়াজ—সাঁবধান যেঁও না। বাঁপী তুঁমি বাঁড়ি ফিঁরে যাঁও।

আমি থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লাম। টর্চ আর লাঠিটা হাত থেকে পড়ে গেল। পড়বার সময় হাতের চাপ লেগে টর্চটা জ্বালা অবস্থাতেই মাটিতে পড়েছে। চিকচিক করে একটা ছুঁচো গা ঘেঁষে চলে গেল। আলোটা তুলে যে বেতবনের দিকে ধরবো, তখন সে অবস্থাও নেই। আলোটার সামনেই একখানা ইঁট, তাই পেছনটাও সম্পূর্ণ অন্ধকার। কি এক শক্তিতে জানি না আমি ওই আধলা ইঁটখানা হাতে নিয়ে চিৎকার করে উঠলাম—কে আছো বেরিয়ে এসো নইলে আমি ইঁট ছুঁড়তে থাকবো।

মন্ত্রের মতো কাজ হল। বেতবনের পেছন থেকে আওয়াজ এলো—"বাপী কি করছিস দাঁড়া। ইঁট ফিঁট ছুঁড়িস না মাথা ফেটে যাবে।" আমি ইঁটখানা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ওপাশ থেকে একটা জোরালো টর্চের আলো আমার মুখে এসে পড়লো। আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিশুকাকা। পেছনে তরুণ আর কাঞ্চন। বিশুকাকা আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন—হ্যাঁ তোর সাহস আছে। ওদের দিকে ফিরে বললেন—তরুণ কাঞ্চন কাল বাপীকে এক সের রসোগোল্লা খাইয়ে দেবে।

আমি তরুণের হাত ধরে টানতে টানতে শবযাত্রী চটিতে নিয়ে গিয়ে পকেট থেকে ওর দেওয়া চকের টুকরোটা বার করে টর্চের আলোয় বড় বড় করে লিখলাম—বাপী।

পরের দিন বাজির রসগোল্লা যেমন পেয়েছিলাম তেমনি অতরাত্রে শ্মশানে যাবার জন্য বাবার হাতে উত্তম মধ্যমও খেয়েছিলাম।

---

## ৪১৫ পৃষ্ঠার মজার খেলার উত্তর

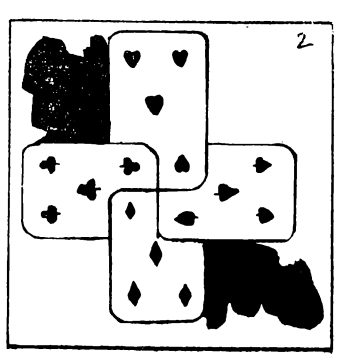

অসীম চট্টোপাধ্যায়

সে অনেকদিন আগের কথা। একটা দেশ ছিল। দেশটা ছিল খুব সুন্দর—পাহাড় আর সমুদ্রে ঘেরা। ওখানকার মানুষগুলো খুব সুখে আর শান্তিতে ছিল। তাদের গোলাভর্তি ধান, গোয়ালভর্তি গরু আর পুকুরভর্তি মাছ ছিল। সারাদিন ওরা মাঠে-মাঠে চাষবাস করতো আর সন্ধ্যেতে বসে কথকতা শুনতো।

সে দেশের রাজাও ছিলেন খুব দয়ালু, কিন্তু ন্যায়ের প্রতি ছিলেন সদয় আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভীষণ কঠিন। তিনি দেবতা আর ব্রাহ্মণদের খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। প্রত্যেকদিন দেবতার পুজো আর ব্রাহ্মণদের দান না করে তিনি কখনও জলগ্রহণ করতেন না। এমনি ছিল তাঁর নিষ্ঠা। দৃঢ় হাতে শাসন করার ফলে তাঁর রাজ্যে কোন চুরি ডাকাতি ছিল না। ছিল না কোন ছল চাতুরি প্রতারণা। গৃহস্থেরা দরজা খুলে রাত্রে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারতো।

সেই শান্তির রাজ্যে একদিন অশান্তির মেঘ দেখা গেল। কোথা থেকে একটা লোক এল। যেমন তার অদ্ভুত চেহারা তেমনি অদ্ভুত ওর সাজপোশাক। যেমন মোটা, তেমনি বড় ভুঁড়ি, সে তুলনায় মাথাটা খুব ছোট। কিন্তু ছোট হলে কি হবে, ছোট মাথায় বিরাট পাগড়ি। কাঁধে একটা ঝোলা। সেই ঝোলায় ছিল একটা শিঙ্গা। লোকটা রাজপথের উপরে দাঁড়িয়ে শিঙ্গা ফুঁকতে লাগলো। ওর অদ্ভুত শরীর আর সাজপোশাক দেখে এবং শিঙ্গার অদ্ভুত আওয়াজ শুনে চারদিক থেকে লোক এসে তার চারপাশে জমতে লাগল।

যখন অনেক লোক জমা হল তখন ঐ অদ্ভুত লোকটা বলল—আমি দুনিয়ার সবচাইতে সেরা

জাদুকর। আমি যা বলব তাই হবে। আজ থেকে এ রাজ্যটা আমার কথামত চলবে।

কথাটা কানে কানে চলে গেল ওখানকার সেনাধ্যক্ষের কাছে। সেনাধ্যক্ষ তখন কিছু ঘোড়-সওয়ার নিয়ে ছুটে এলেন।

সেখান এসে শুনতে পেলেন তখনও লোকটা জোরে জোরে চেঁচিয়ে বলছে—আজ থেকে আমি এ দেশের রাজা। তোরা আমার হুকুম মেনে চলবি। যে আমার কথা না শুনবে তাকে আমি চরম শাস্তি দেব। আমি এই দিনদুনিয়ার সেরা জাদুকর। আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি।

লোকটার কথা শুনে সেনাধ্যক্ষ বেজায় রেগে গেলেন। ওকে ডেকে বললেন—চল আমাদের রাজার কাছে। তোমার কি হাল করি বুঝবে। চাবকে চাবকে তোমার পিঠের চামড়া তুলে নেব।

এ কথা শুনে জাদুকর হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো। তারপরেই ভীষণ রেগে কর্কশস্বরে বললো—আরে বেয়াদপ, তোর তো সাহস কম নয়? আমি যাবো কোন্ রাজার কাছে? আজ থেকে তো এই দেশের রাজা আমি। এখন থেকে তোরা সব আমার কথায় চলবি।

জাদুকরের কথা শুনে সেনাধ্যক্ষের রাগ চরমে উঠল। তিনি অগ্নিমূর্তি হয়ে সেনাদের বললেন—বেটাকে লোহার শেকলে বেঁধে কারাগারে নিক্ষেপ কর, আর ওর পোশাক খুলে খালি দেহে গুনে গুনে একশো চাবুক মার।

হুকুম পাওয়া মাত্র সেনারা লোহার শেকল দিয়ে জাদুকরের হাত দুটো বাঁধলো। বাঁধার পর সেনারা এবং সেনাধ্যক্ষ অবাক্ হয়ে দেখলেন যে ঐ মজবুত লোহার শেকল পচা সুতার মত পট করে ছিঁড়ে পড়ল। হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগলো জাদুকর সেনাদের বিমূঢ় ভাব দেখে।

সেনাধ্যক্ষ প্রথমে একটু দমে গেলেন। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে সেনাদের বললেন—তোমরা ওকে হাত ধরে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাও।

প্রথমে চারজন গাঁট্টাগোঁট্টা পালোয়ান সৈন্য গিয়ে জাদুকরের হাত ধরলো, কিন্তু জাদুকরকে এক চুলও নড়াতে পারলে না। তখন একে একে পঞ্চাশ জন সৈন্য এগিয়ে এলো। তারা একসঙ্গে চেষ্টা করলো। জাদুকরকে এক চুল নড়াতে পারলো না। তখন জাদুকর অতি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাত ঝাড়া দিয়ে ওদের কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সে রাস্তা থেকে এক মুঠো ধুলো হাতে তুলে মন্ত্র পড়ে ছুঁড়ে মারলো। নিমেষে হাজার হাজার সাপ চারদিক থেকে সৈন্যদের দিকে ছুটে আসতে আরম্ভ করলো।

এই না দেখে সৈন্যরা এবং সেনাধ্যক্ষ এমন ভয় পেয়ে গেল যে, তক্ষুণি ঘোড়ায় চড়ে ছুটতে ছুটতে পালিয়ে গেল। জাদুকর তখন হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগলো। চেঁচিয়ে বলতে লাগলো—এই তো ক্ষমতা তোমাদের রাজার সেনাদের!

ওদিকে সেনারা এবং সেনাধ্যক্ষ ছুটতে ছুটতে, হাঁপাতে হাঁপাতে সটান রাজার কাছে গিয়ে হাজির হলো। রাজা তখন রাজকার্য শেষ করে ভাঁড়ের কথা শুনে হাসছিলেন। সেনাধ্যক্ষকে ঐ রকম হাঁকপাক করে ঢুকতে দেখে রাজা অবাক্ হয়ে গেলেন।

সেনাধ্যক্ষ তখন হাঁপাতে হাঁপাতে রাজাকে ঐ জাদুকরের কথা সব বিশদভাবে বললেন। রাজা সব ব্যাপার শুনে প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেলেন। তারপরেই তিনি রাগে ফেটে পড়লেন। সেনাপতিকে আদেশ দিলেন—এক্ষুণি এক হাজার সৈন্য নিয়ে তৈরী হয়ে এসো। আমি নিজেই জাদুকরের সঙ্গে মোকাবিলা করতে যাবো। রাজা চিৎকার করে বললেন—আমি দেখবো জাদুকরের

কতবড় ক্ষমতা। ওকে আমি জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে ফেলবো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেনাপতি এক হাজার ঘোড়সওয়ার নিয়ে হাজির হলেন। সেনাদের যেমনি পালোয়ানি চেহারা তেমনি তাদের সাজ-পোশাক আর হাতে মারাত্মক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র। সেনাধ্যক্ষ পথ দেখিয়ে অগ্রসর হলেন।

জাদুকরের কাছাকাছি গিয়ে রাজা দেখেন যে জাদুকরটা তেমনি হম্বি তম্বি করে যাচ্ছে, আর রাজ্যের প্রজারা দূরে দাঁড়িয়ে অবাক্ হয়ে জাদুর খেলা দেখছে, আর ভয়ে কাঁপছে। রাজামশাই গেলেন আরো রেগে। তিনি তক্ষুণি সৈন্যদের আদেশ দিলেন জাদুকরকে ঘিরে ফেলে একসাথে আক্রমণ কর।

রাজার আদেশ পাওয়া মাত্র সেনারা জাদুকরকে ঘিরে ফেলে মারাত্মক সব অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করলো। কিন্তু আক্রমণ করলে কি হবে? ওদের সব আক্রমণ বিফল হলো। ওদের সব অস্ত্রশস্ত্র জাদুকরের গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত কাটতে পারলো না।

ওদের চেষ্টা ব্যর্থ হলো দেখে জাদুকর হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে বিদ্রূপ করতে লাগলো।

রাজা তখন নিজেই ভীমবিক্রমে জাদুকরকে তরোয়াল উঁচিয়ে আক্রমণ করলেন। আগের মত বার বার তরোয়াল দিয়ে আঘাত করলেন। সব মিথ্যা। জাদুকরের কিছুই হলো না। সে তখনও হেসে যাচ্ছিলো। তারপর হাসি থামিয়ে রাজার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকালো। মনে হলো চোখের মধ্যে থেকে কি এক তীক্ষ্ণ তেজ এসে রাজাকে আঘাত করলো সেই আঘাতে রাজার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেল। তরোয়াল নিয়ে হাত আর ওঠাতে পারলেন না। তখনো কিন্তু রাজার সৈন্যরা জাদুকরকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, যাতে জাদুকর পালিয়ে না যেতে পারে।

হঠাৎ জাদুকর আকাশের দিকে মুখ তুলে কি মন্ত্র পড়লো, আর একমুঠো ধুলো আকাশের দিকে ছুঁড়ে মারলো। অমনি নিকষ-কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। মেঘে ভীষণ গর্জন শুরু হলো আর শুরু হলো মুহুর্মুহু বজ্রপাত। সেই সাথে শুরু হলো ভয়ংকর ঝড়। মনে হলো গাছপালা, বাড়িঘর সব যেন উড়ে যাবে। সেনারা অনেক কষ্টে ধরাধরি করে নিজেদের সামলে দাঁড়িয়ে রইলো।

কিন্তু তারপরেই দেখা গেল কালো আকাশ থেকে টপ টপ করে নেমে আসতে লাগলো হাজার হাজার রাক্ষস। তাদের কারো মাথা আছে, কারো বা নেই। কারো চোখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে, কারো বা মুখ দিয়ে। বিশাল বিশাল তাদের চেহারা। বিরাট বিরাট মুখ আর বিরাট বিরাট দাঁত।

ওদের দেখে ভয়ে সেনারা সব পালাতে লাগলো। কিন্তু পালাতে পথ পাবে কোথায়? চারদিক থেকেই রাক্ষসেরা ওদের দিকে ধেয়ে আসছিল। রাজা দেখতে লাগলেন রাক্ষসেরা চারদিকে কিলবিল করছে—সৈন্য, ঘোড়া যা পাচ্ছে সব গিলে ফেলছে। ভয়ে রাজার হাত পা থরথর করে কাঁপতে লাগলো। রাজা আর কোন উপায় না দেখে জাদুকরের সামনে হাঁটু গেড়ে প্রাণভিক্ষা চাইতে লাগলেন। এদিকে ততক্ষণে রাক্ষসেরা সৈন্য আর ঘোড়া সব খেয়ে শেষ করে ফেলেছে।

রাজার অনুনয়ে জাদুকর একটু নরম হলো। রাগ কমিয়ে আবার একটা মন্ত্র পড়ার সাথে সাথে রাক্ষসেরা মিলিয়ে গেল। ঝড় থেমে গেল। আকাশ থেকে মেঘ কেটে গেল, আর আকাশে আবার সূর্য দেখা দিলো। জাদুকর রাজাকে বললো—তোকে মাপ করে দিলাম। ফের বেয়াদবি করলে খতম করে দেবো। আজ থেকে তোর

জাদুকর। আমি যা বলব তাই হবে। আজ থেকে এ রাজ্যটা আমার কথামত চলবে।

কথাটা কানে কানে চলে গেল ওখানকার সেনাধ্যক্ষের কাছে। সেনাধ্যক্ষ তখন কিছু ঘোড়-সওয়ার নিয়ে ছুটে এলেন।

সেখান এসে শুনতে পেলেন তখনও লোকটা জোরে জোরে চেঁচিয়ে বলছে—আজ থেকে আমি এ দেশের রাজা। তোরা আমার হুকুম মেনে চলবি। যে আমার কথা না শুনবে তাকে আমি চরম শাস্তি দেব। আমি এই দিনদুনিয়ার সেরা জাদুকর। আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি।

লোকটার কথা শুনে সেনাধ্যক্ষ বেজায় রেগে গেলেন। ওকে ডেকে বললেন—চল আমাদের রাজার কাছে। তোমার কি হাল করি বুঝবে। চাবকে চাবকে তোমার পিঠের চামড়া তুলে নেব।

এ কথা শুনে জাদুকর হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো। তারপরেই ভীষণ রেগে কর্কশস্বরে বললো—আরে বেয়াদপ, তোর তো সাহস কম নয়? আমি যাবো কোন্ রাজার কাছে? আজ থেকে তো এই দেশের রাজা আমি। এখন থেকে তোরা সব আমার কথায় চলবি।

জাদুকরের কথা শুনে সেনাধ্যক্ষের রাগ চরমে উঠল। তিনি অগ্নিমূর্তি হয়ে সেনাদের বললেন—বেটাকে লোহার শেকলে বেঁধে কারাগারে নিক্ষেপ কর, আর ওর পোশাক খুলে খালি দেহে গুনে গুনে একশো চাবুক মার।

হুকুম পাওয়া মাত্র সেনারা লোহার শেকল দিয়ে জাদুকরের হাত দুটো বাঁধলো। বাঁধার পর সেনারা এবং সেনাধ্যক্ষ অবাক্ হয়ে দেখলেন যে ঐ মজবুত লোহার শেকল পচা সুতার মত পট করে ছিঁড়ে পড়ল। হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগলো জাদুকর সেনাদের বিমূঢ় ভাব দেখে।

সেনাধ্যক্ষ প্রথমে একটু দমে গেলেন। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে সেনাদের বললেন—তোমরা ওকে হাত ধরে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাও।

প্রথমে চারজন গাঁট্টাগোঁট্টা পালোয়ান সৈন্য গিয়ে জাদুকরের হাত ধরলো, কিন্তু জাদুকরকে এক চুলও নড়াতে পারলে না। তখন একে একে পঞ্চাশ জন সৈন্য এগিয়ে এলো। তারা একসঙ্গে চেষ্টা করলো। জাদুকরকে এক চুল নড়াতে পারলো না। তখন জাদুকর অতি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাত ঝাড়া দিয়ে ওদের কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সে রাস্তা থেকে এক মুঠো ধুলো হাতে তুলে মন্ত্র পড়ে ছুঁড়ে মারলো। নিমেষে হাজার হাজার সাপ চারদিক থেকে সৈন্যদের দিকে ছুটে আসতে আরম্ভ করলো।

এই না দেখে সৈন্যরা এবং সেনাধ্যক্ষ এমন ভয় পেয়ে গেল যে, তক্ষুণি ঘোড়ায় চড়ে ছুটতে ছুটতে পালিয়ে গেল। জাদুকর তখন হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগলো। চেঁচিয়ে বলতে লাগলো—এই তো ক্ষমতা তোমাদের রাজার সেনাদের!

ওদিকে সেনারা এবং সেনাধ্যক্ষ ছুটতে ছুটতে, হাঁপাতে হাঁপাতে সটান রাজার কাছে গিয়ে হাজির হলো। রাজা তখন রাজকার্য শেষ করে ভাঁড়ের কথা শুনে হাসছিলেন। সেনাধ্যক্ষকে ঐ রকম হাঁকপাক করে ঢুকতে দেখে রাজা অবাক্ হয়ে গেলেন।

সেনাধ্যক্ষ তখন হাঁপাতে হাঁপাতে রাজাকে ঐ জাদুকরের কথা সব বিশদভাবে বললেন। রাজা সব ব্যাপার শুনে প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেলেন। তারপরেই তিনি রাগে ফেটে পড়লেন। সেনাপতিকে আদেশ দিলেন—এক্ষুণি এক হাজার সৈন্য নিয়ে তৈরী হয়ে এসো। আমি নিজেই জাদুকরের সঙ্গে মোকাবিলা করতে যাবো। রাজা চিৎকার করে বললেন—আমি দেখবো জাদুকরের

কতবড় ক্ষমতা। ওকে আমি জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে ফেলবো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেনাপতি এক হাজার ঘোড়সওয়ার নিয়ে হাজির হলেন। সেনাদের যেমনি পালোয়ানি চেহারা তেমনি তাদের সাজ-পোশাক আর হাতে মারাত্মক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র। সেনাধ্যক্ষ পথ দেখিয়ে অগ্রসর হলেন।

জাদুকরের কাছাকাছি গিয়ে রাজা দেখেন যে জাদুকরটা তেমনি হম্বি তম্বি করে যাচ্ছে, আর রাজ্যের প্রজারা দূরে দাঁড়িয়ে অবাক্ হয়ে জাদুর খেলা দেখছে, আর ভয়ে কাঁপছে। রাজামশাই গেলেন আরো রেগে। তিনি তক্ষুণি সৈন্যদের আদেশ দিলেন জাদুকরকে ঘিরে ফেলে একসাথে আক্রমণ কর।

রাজার আদেশ পাওয়া মাত্র সেনারা জাদুকরকে ঘিরে ফেলে মারাত্মক সব অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করলো। কিন্তু আক্রমণ করলে কি হবে? ওদের সব আক্রমণ বিফল হলো। ওদের সব অস্ত্রশস্ত্র জাদুকরের গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত কাটতে পারলো না।

ওদের চেষ্টা ব্যর্থ হলো দেখে জাদুকর হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে বিদ্রূপ করতে লাগলো।

রাজা তখন নিজেই ভীমবিক্রমে জাদুকরকে তরোয়াল উঁচিয়ে আক্রমণ করলেন। আগের মত বার বার তরোয়াল দিয়ে আঘাত করলেন। সব মিথ্যা জাদুকরের কিছুই হলো না। সে তখনও হেসে যাচ্ছিলো। তারপর হাসি থামিয়ে রাজার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকালো। মনে হলো চোখের মধ্যে থেকে কি এক তীক্ষ্ণ তেজ এসে রাজাকে আঘাত করলো সেই আঘাতে রাজার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেল। তরোয়াল নিয়ে হাত আর ওঠাতে পারলেন না। তখনো কিন্তু রাজার সৈন্যরা জাদুকরকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, যাতে জাদুকর পালিয়ে না যেতে পারে।

হঠাৎ জাদুকর আকাশের দিকে মুখ তুলে কি মন্ত্র পড়লো, আর একমুঠো ধুলো আকাশের দিকে ছুঁড়ে মারলো। অমনি নিকষ-কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। মেঘে ভীষণ গর্জন শুরু হলো আর শুরু হলো মুহুর্মুহু বজ্রপাত। সেই সাথে শুরু হলো ভয়ংকর ঝড়। মনে হলো গাছপালা, বাড়িঘর সব যেন উড়ে যাবে। সেনারা অনেক কষ্টে ধরাধরি করে নিজেদের সামলে দাঁড়িয়ে রইলো।

কিন্তু তারপরেই দেখা গেল কালো আকাশ থেকে টপ টপ করে নেমে আসতে লাগলো হাজার হাজার রাক্ষস। তাদের কারো মাথা আছে, কারো বা নেই। কারো চোখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে, কারো বা মুখ দিয়ে। বিশাল বিশাল তাদের চেহারা। বিরাট বিরাট মুখ আর বিরাট বিরাট দাঁত।

ওদের দেখে ভয়ে সেনারা সব পালাতে লাগলো। কিন্তু পালাতে পথ পাবে কোথায়? চারদিক থেকেই রাক্ষসেরা ওদের দিকে ধেয়ে আসছিল। রাজা দেখতে লাগলেন রাক্ষসেরা চারদিকে কিলবিল করছে—সৈন্য, ঘোড়া যা পাচ্ছে সব গিলে ফেলছে। ভয়ে রাজার হাত পা থরথর করে কাঁপতে লাগলো। রাজা আর কোন উপায় না দেখে জাদুকরের সামনে হাঁটু গেড়ে প্রাণভিক্ষা চাইতে লাগলেন। এদিকে ততক্ষণে রাক্ষসেরা সৈন্য আর ঘোড়া সব খেয়ে শেষ করে ফেলেছে।

রাজার অনুনয়ে জাদুকর একটু নরম হলো। রাগ কমিয়ে আবার একটা মন্ত্র পড়ার সাথে সাথে রাক্ষসেরা মিলিয়ে গেল। ঝড় থেমে গেল। আকাশ থেকে মেঘ কেটে গেল, আর আকাশে আবার সূর্য দেখা দিলো। জাদুকর রাজাকে বললো—তোকে মাপ করে দিলাম। ফের বেয়াদবি করলে খতম করে দেবো। আজ থেকে তোর

প্রাসাদে আমি থাকবো। তোর যে একটা মাত্র খুব সুন্দরী মেয়ে আছে তাকে আমি বিয়ে করবো, আর আজ থেকে তুই হবি আমার প্রধান চাকর। না হলে সমস্ত দেশটা নষ্ট করে দেবো।

রাজা অপমানে মুখ নীচু করে খানিক চিন্তা করলেন। বুঝতে পারলেন যে জাদুকরের কথা না মানলে জাদুকর সমস্ত দেশটাকে নষ্ট করে দেবে। তাই ভীষণ অপমান সত্ত্বেও রাজা জাদুকরের প্রস্তাবে রাজী হলেন, রাজ্যের আর প্রজাদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে।

জাদুকর রাজার সাথে সাথে রাজপ্রাসাদে গেল। রাজা প্রাসাদে গিয়ে সবাইকে ডেকে বললেন—আজ থেকে আমি আর রাজা নই। রাজা হলেন এই জাদুকর। যে এ কথা না মানবে তার মৃত্যু অবধারিত।

মেয়েকে গিয়ে জাদুকরকে বিয়ে করার কথা বলতেই রাজকন্যা বললেন যে, তিনি প্রাণ থাকতেও জাদুকরকে বিয়ে করতে পারবেন না।

রাজা অনেক বোঝাতে শেষ পর্যন্ত রাজকন্যা রাজী হলেন, কিন্তু একটা শর্তে। শর্তটা হলো যে, রাজকন্যা একটা ব্রত করছেন এবং সেটা শেষ হতে এক বৎসর লাগবে। ব্রত শেষ হলে এক-বৎসর পরে রাজকন্যা জাদুকরকে বিয়ে করবেন। জাদুকরও রাজকন্যার শর্ত শুনে আপত্তি করল না।

জাদুকর বেশ আনন্দে আছে—খায়-দায় আর ঘুমোয়। যখন যাকে খুশী, যা খুশী হুকুম করে। সবাইকে নতমুখে তা পালন করতে হয়। কেননা সবাই জাদুকরের ভয়ে ভীত। রাজাকে সব সময়ে জাদুকরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় জাদুকরের হুকুম শোনার জন্য এবং তৎক্ষণাৎ তা পালন করার জন্য। জাদুকর রাজকার্য দেখতো না। নিজের স্ফূর্তিতে বিভোর। ওর নিজের কাজটা ঠিকমত হলেই ও সন্তুষ্ট থাকতো। রাজ্যের ভালমন্দের কথা একবারও ভাবতো না। ফলে রাজ্যে দেখা দিলো নানা বিশৃঙ্খলা, অভাব-অনটন, অশান্তি।

এভাবে বেশ কিছুদিন কাটার পর নানা দুঃখে-কষ্টে সেই রাজ্যের প্রজারা পাগল হয়ে ক্ষেপে উঠলো। দুঃখ-কষ্ট দূর করার কোন রাস্তা খুঁজে পেলো না। সবাই বুঝতে পারলো যে জাদুকর রাজা হওয়ার ফলে তাদের এই দুঃখ-কষ্ট। ধীরে ধীরে প্রজারা জাদুকরের উপরে খাপ্পা হয়ে উঠলো। দুঃখকষ্ট যখন চরমে উঠলো তখন প্রজারা ক্ষেপে গিয়ে রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করলো, জাদুকরকে মেরে ফেলার জন্য।

জাদুকরও ছিল সাংঘাতিক প্রকৃতির লোক। প্রজাদের এই ব্যাপার দেখে রেগে সমস্ত প্রজাদের পাখি বানিয়ে দিল। সমস্ত ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট ছোট ছোট হয়ে গেল। প্রজারা ভয়ে ভয়ে দেখলো যে ওরা সবাই পাখি হয়ে গেছে। পাখি হয়ে তো আর মানুষকে আক্রমণ করতে পারবে না। দুঃখে কষ্টে ওরা তখন নিজেদের মধ্যে মারামারি, ঝগড়া-ঝাঁটি শুরু করে দিলো। সেই যে ও রাজ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি মারামারি শুরু হলো তা তো কমলোই না বরং দিনে দিনে বেড়ে যেতে আরম্ভ করলো।

দিন যায় রাত্রি আসে—রাত্রি যায় দিন আসে। এভাবে প্রায় এক বৎসর শেষ হতে চললো। জাদুকর খুব মজায় আছে যে, শীঘ্র তার সাথে রাজ-কন্যার বিয়ে হবে।

এমনি সময় একদিন ময়ূরপঙ্খী জাহাজে চড়ে এক ভিন দেশের রাজপুত্র সেখানে এসে হাজির। রাজপুত্র অবাক্ হয়ে দেখলেন যে, সেই রাজ্যে পাখি ছাড়া আর কিছুই নেই। ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট সবই আছে, কিন্তু সে সবই চালাচ্ছে সব পাখিরা। শুধু তাই নয়, পাখিরা মানুষের মত কথাও বলছে। তখন রাজপুত্র পাখিদের সাথে কথাবার্তা বলে

জানতে পারলে যে, ঐ দেশটি আগে খুব সুন্দর ছিল। এক জাদুকর এসে ওদের এই অবস্থা করেছে। পাখির মত দেখতে হলেও আসলে ওরা মানুষ।

সব শুনে রাজপুত্রের মনে খুব দুঃখ হলো। তিনি ভাবলেন যে, ঐ জাদুকরকে মেরে তিনি ঐ রাজ্য জয় করে সব পাখিদের আবার মানুষ করার চেষ্টা করবেন। তিনি তখন সব পাখিদের ডেকে একটা সভা করে জাদুকরকে হটিয়ে দেয়ার কথা ভাবতে বললেন। পাখিরা বলল যে, ওরা পাখি তাই ওদের পক্ষে জাদুকরের সাথে লড়াই করা সম্ভব নয়। তাছাড়া জাদুকর এমন ভয়ংকর ও নানারকম জাদু জানে যে, ওর সাথে এঁটে ওটা মুশকিল।

ওদের সভা চলাকালীন জাদুকর রাজপুত্রের আসার ও সভা করার কথা জানতে পারে। জেনে ঐ প্রাসাদ থেকে হাজার হাজার রাক্ষস পাঠিয়ে দেয়। মুখ দিয়ে আগুন বার করতে করতে রাক্ষসেরা ওদের দিকে ছুটে আসে।

ঐ না দেখে পাখিরা যে যার এদিক ওদিক পালিয়ে গেল। রাজপুত্রও বুঝলেন ব্যাপার বিশেষ সুবিধের নয়। পালিয়ে তিনি আর জাহাজে উঠবার সময় পেলেন না। সামনে ছিল সমুদ্র। তিনি সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

কিছুদূর সাঁতরে যাওয়ার পর রাজপুত্র দেখতে পেলেন, যে, রাক্ষসদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা আগুনে ওঁর জাহাজটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। রাজপুত্র ভাসতে ভাসতে অনেক দূরে আর একটা দেশে গিয়ে উঠলেন। সেই দেশটা ছিল খুব সুন্দর। ঐ দেশের লোকের সাথে কথাবার্তা বলে রাজপুত্র জানতে পারলেন যে, ঐ দেশেও আগে নানা অশান্তি ছিল। কিন্তু ঐ দেশে একজন সাধু আসে এবং তার দয়া হওয়াতে ওখানে আর কোন অশান্তি নেই।

সাধু তখন রাজপুত্রকে কাপড় দিয়ে বাঁধা একটা পুঁথি দিলেন।

রাজপুত্র খুঁজে খুঁজে ঐ সাধুকে বের করলেন। তিনি সাধুকে পাখির রাজ্য ও জাদুকরের কথা সব বললেন। তিনি সাধুর কাছে জানতে চাইলেন ঐ জাদুকরকে মেরে পাখিদের উদ্ধার করার কোন উপায় আছে কিনা।

সাধু তখন রাজপুত্রকে লাল সালুর কাপড় দিয়ে বাঁধা একটা পুঁথি দিলেন এবং বললেন, ঐ পুঁথিতে সব মন্ত্র ও বিধান দেওয়া আছে। পাখিরা যদি ঐ মন্ত্র জপতে শুরু করে এবং পুঁথির বিধান সব ঠিক ঠিক মানে তবে জাদুকরের কোন মন্ত্র ওদের উপর কাজ করবে না। জাদুকরের কোন রাক্ষস, সাপ বা কোন অন্য ভেলকি ওদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ওদের মধ্যে এমন

শক্তি আসবে যে ওরা কোন ভয়-ডরে ভীত হবে না। ওরা ওদের আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে, ফিরে পাবে ওদের মনুষ্যত্ব। আর জাদুকরকে ওরা অনায়াসে মেরে ফেলতে পারবে। ফিরে আসবে ওদের দেশে শান্তি।

রাজপুত্র তখন ঐ পুঁথি নিয়ে একটা জাহাজ যোগাড় করে চুপি চুপি গিয়ে ঐ দেশে হাজির হলেন। গোপনে গোপনে সবাইকে ঐ পুঁথির মন্ত্র পড়াতে লাগলেন। জাদুকর প্রথমে টের পায়নি। যখন টের পেলো তখন বেশ দেরি হয়ে গেছে। কারণ রাজ্যের বেশির ভাগ মানুষ-পাখি তখন ঐ মন্ত্র পড়তে এবং শিখতে আরম্ভ করে দিয়েছে। ওরা সবাই ঐ পুঁথির বিধান অনুযায়ী নিজেদের চালাতে শুরু করেছে। ফলে ওদের পাখিত্ব চলে গিয়ে ওরা আবার মানুষ হতে লাগলো। যারা প্রথমে ভয় পাচ্ছিলো তারাও অন্যদের মানুষ হতে দেখে মন্ত্র শিখতে শুরু করলো। ফলে বেশির ভাগ পাখিই আবার মানুষ হয়ে গেল।

জাদুকর তার ঝোলাতে যতরকম ভেলকি ও জাদু ছিল সব প্রয়োগ করতে লাগলো। ঐ জাদু মানুষদের আর কোন ক্ষতিই করতে পারলো না। হাজার হাজার রাক্ষস তেড়ে এলো। হাজার হাজার সাপ ফোঁস ফোঁস করতে করতে তেড়ে এল, কিন্তু মানুষের তেজের কাছে ওরা সবাই পুড়ে মরলো। তখন সবাই গিয়ে জাদুকরকে ধরে নিয়ে এসে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারলো। রাজ্যে আর মানুষ-পাখি রইলো না। সব মানুষ-পাখিই আবার মানুষ হয়ে গেল।

শুধু ভয় দেখিয়ে মানুষকে বেশীদিন ঠেকিয়ে রাখা যায় না, জাদুকরের পরিণতি দেখে বোঝা গেল।

তারপর একদিন ধুমধাম করে রাজপুত্রের সাথে রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল। রাজা রাজপুত্রকে রাজ্যের ভার দিয়ে বনে গেলেন তপস্যা করতে।

রাজপুত্র কিন্তু রাজা হলেন না। তিনি দেশের সবাইকে ডেকে বললেন—জাদুকর দেশের অনেক ক্ষতি করেছে। দেশটাকে আবার গড়ে তুলতে হবে। আমি রাজা হলে আমার উপর সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকবে। কোন লোক সে যত বড়ই হোক, একা কোন দেশকে গড়ে তুলতে পারে না। তাই তোমাদের সবাইকে দায়িত্ব নিতে হবে। দেশ ও দেশের মানুষ সব চাইতে বড়। মানুষ কেউ কারো থেকে ছোট বা বড় নয়। তাই এদেশে কোন রাজা থাকবে না, কোন প্রজা থাকবে না। আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই প্রজা।

তখন সবাই একসাথে গলা মিলিয়ে গান ধরলো—

মোদের দেশে নেইকো রাঁজা, নেইকো প্রজা,
মোরা সবাই রাজা—মোরা সবই প্রজা।

---

## চোখের ভুল

পাশের ছবিটি দেখ। লম্বা আয়তক্ষেত্রটির উপরের দিকে 'বাঁ পাশে' একটি লাইন এবং নীচের দিকে ডান পাশে দুটি লাইন রয়েছে। এখন বল তো, উপরের লাইনটির সোজাসুজি নীচের কোন্ লাইনটা টানা হয়েছে? তোমার চোখের দৃষ্টিতে যে লাইনটা মনে হচ্ছে, আসলে কিন্তু সে লাইনটা নয়।

## শ্রীমধুসূদন মজুমদার

ইন্দ্রপাত হল রাজস্থানে। বীরলোকে মহাপ্রয়াণ করেছেন রাণা সঙ্গ।

একাশিটি রণস্থলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাশূর। পরাজয় বরণ করেছেন তার মধ্যে একটিবার মাত্র। মুঘলকেশরী বাবরের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা করতে গিয়ে। সে-পরাজয় ছিল ভারতভাগ্যবিধাতার দুর্লঙ্ঘ্য বিধান, খণ্ড ভিন্ন বিচ্ছিন্ন ভারতে আর একবার ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ মহাসাম্রাজ্য একটা গড়ে তুলবার প্রয়োজন যিনি উপলব্ধি করেছিলেন মর্মান্তিকভাবে। হায়, সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার প্রতিভা সেদিন আর হিন্দুর ছিল না। চন্দ্রগুপ্ত সমুদ্রগুপ্ত রাষ্ট্রকূট গোবিন্দ চোল রাজেন্দ্রর যুগ তখন অস্তমিত।

স্বর্গলাভ করেছেন সঙ্গ। মেবারের রাজাসনে অভিষেক হল তরুণ রাজপুত্র রত্নের, দুই চোখে যাঁর সূর্যের দীপ্তি, কবাটবক্ষে যাঁর প্রভঞ্জনের সাহস। রাজোয়ারার অন্ট স্বাধীন রাষ্ট্র থেকে শুভেচ্ছা নিয়ে চিতোর দুর্গে শুভাগমন হল রণশূর প্রবীণ সামন্তবর্গের, সঙ্গকে যাঁরা চিনতেন, সঙ্গের পাশে দাঁড়িয়ে বাবরশার সৈনাপত্যগুণের ইন্দ্রজাল যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন খানুয়ার যুদ্ধে।

অভিষেকের মাঙ্গলিক কৃত্য সবই যথাযথ অনুষ্ঠিত হল। এবার সভারোহণ করে অতিথিবর্গের সঙ্গে বান্ধবোচিত বিশ্রম্ভালাপের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন রাণা, এমন সময়ে এল এক অপ্রত্যাশিত সংবাদ। একবার মাত্র গম্ভীর নির্ঘোষে বেজে উঠল দুর্গদ্বারের নাকাড়া। একবার মাত্র! যার তাৎপর্য হল এই যে অপ্রত্যাশিতভাবে কোন একজন মাননীয় রাজদূত শুভাগমন করেছেন চিতোর দুর্গে।

কে? কে? কে হতে পারে? প্রত্যাশিত নিমন্ত্রিত যাঁরা ছিলেন, তাঁরা ত এসে গিয়েছেন কয়েকদিন পূর্বেই। এই মুহূর্তে তাঁরা ত সশরীরে উপস্থিতও আছেন রাজসভায়। এখন তা হলে কে আসবেন? অবশ্যই অপ্রত্যাশিত! রবাহূত! তা অবশ্য বিশাল ভারতের যে কোন অঞ্চল থেকে রাজপুত শৌর্য মহিমায় অনুরাগী যে কোন রাজশক্তি পাঠিয়ে থাকতে পারেন রাজদূত, সৌজন্যের ইঙ্গিত

হিসাবে। কিন্তু নাকাড়া বাজে কেন? সিংহদ্বারের রক্ষীরা কাকে এতখানি সম্মানের যোগ্য বলে বিবেচনা করেছে যে তার আগমন ঘোষণা করে নাকাড়ায় ঘা না দিয়ে পারল না?

সংবাদ এল বায়ুবেগে। ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এল প্রৌঢ় রণধীর সিং, দ্বাররক্ষী চমূর মহাপ্রতিহার। যথারীতি প্রণিপাতের জন্যই সে প্রস্তুত হচ্ছিল, নবীন রাণা হাতের ইশারায় তাকে নিরস্ত করলেন —"ওসব থাকুক, তোমার সংবাদটাই শোনাও মহাপ্রতিহার! সভাস্থ বীরচূড়ামণিবর্গ জানতে চাইছেন, অপ্রত্যাশিতভাবে কে এলেন আমাদের আনন্দবর্ধন করবার জন্য এই পরিপূর্ণ আনন্দের দিনে।"

"মহারাণা! মুঘল দূত, দিল্লীসুলতানের প্রতিনিধি উজির-উলমুলক শাহাবাজ খাঁ—"

"মু-ঘ-ল দূত?"

সত্যই অপ্রত্যাশিত! একান্তই চমকপ্রদ! কে ভেবেছিল, দিল্লীর সুলতান (মুঘল নরপতিরা তখনও বাদশা বলে নিজেদের প্রচার করতে শুরু করেননি, জনসমাজে স্বীকৃতিও পাননি তখনও বাদশা বলে) চিতোর রাণার অভিষেকে আমন্ত্রিত না হয়েও কূটনৈতিক শিষ্টাচার প্রদর্শনের প্রয়োজন অনুভব করবেন? পারস্পরিক মিত্রতার সম্পর্কও আছে যেখানে, নিমন্ত্রণ না পেলে সেখান থেকেও আসে না এরকম সৌজন্যবাহক প্রতিনিধি। আর এক্ষেত্রে? ওঃ, খানুয়ার রক্তাক্ত স্মৃতি যে এখনও নিখিল রাজপুতজাতির বক্ষে বক্ষে জাগরূক!

এর মানে কী? মানে কী?

পরিহাস? না, বাবরশাকে যারা জানে, ইতরজনোচিত মনোবৃত্তি কেউ তারা আরোপ করে না তাঁর উপরে। তার উপর আবার, একটা উজির মানুষকে কেউ পাঠাতে পারে অভদ্র কোন বার্তার বাহক করে?

মুহূর্তমধ্যে রাণা ভেবে নিলেন, যা ভাববার। দুই চারজনের সঙ্গে মৌন বার্তাও বিনিময় হয়ে গেল চোখে চোখে। যথা মাড়োয়ার রাজভ্রাতা ইন্দ্রভান, হারাবতীর রাওপুত্র শূরমল্ল, যশলমীরের প্রবীণ ভট্টি বীর শঙ্কল সিং—

রাণা বললেন—"মুঘলদূতকে নিয়ে এস। কিছুমাত্র উত্তেজনা প্রকাশের প্রয়োজন নেই। না ভয়ের, না ভক্তির। আর দূতটি যখন পদমর্যাদায় উজির, আমাদের পক্ষ থেকে চম্পাবৎ সর্দার, আর্য সহদেব চাচাজি, আপনি কি যাবেন দূতের প্রত্যুদ্গমনের জন্য?"

চম্পাবৎ সর্দার সহদেব সিংয়ের কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফের ভিতর দিয়ে এক ঝিলিক হাসি প্রকট হয়ে উঠল কয়েক মুহূর্তের জন্য। রাণার উদ্দেশে সম্মতিসূচক শিরঃকম্পন একবারটি, তারপর তিনি নীরবে আসন ত্যাগ করে রণধীর সিংকে বললেন—"চলুন মহাপ্রতিহার! খানুয়ার পরে দু' দুটো বৎসর কেটে গিয়েছে। হিন্দুস্থানের দুধ ঘি খেয়ে আমাদের তুর্কী বন্ধুরা কতখানি মুটিয়েছেন, দেখি গিয়ে—"

কথাটা নিম্নকণ্ঠেই উচ্চারিত হয়েছিল বটে, কিন্তু রাণার কানে ঠিক পৌঁছোলো, তিনি পিছন থেকে কলহাস্যে বলে উঠলেন—"হুঁশিয়ার চাচাজি, কোনরকম অশালীন কথাবার্তা নয়। মোলায়েম কথার মানুষ রাজপুতের দেশে পাওয়াই কঠিন, তা জানি। তবু আপনার উপর আমার ভরসা অনেকখানি—"

"রাণা নিশ্চিন্ত থাকুন"—ঘাড় ফিরিয়ে জবাব দিলেন সহদেব। তাঁর গোঁফ দাড়ির জঙ্গলে যে হাসিটি আগে ছিল দ্বিতীয়ার চাঁদের মত ক্ষীণ, এখন তা অষ্টমীর পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। মুঘলদূতের অর্ধচন্দ্রের ব্যবস্থাই করবেন নাকি সহদেব?

লম্বা-চওড়া পুরুষ এই উজির সাহেবটি। দাড়ি-গোঁফ সহদেব সর্দারের চাইতে তাঁরও কিছু কম নয়। তবে সহদেবের শ্মশ্রু গালপাট্টায় আবদ্ধ, আর শাহাবাজেরটি আবক্ষলম্বিত। প্রতি অঙ্গভঙ্গীর

সঙ্গে তাল রেখে রেখে ধীরে বা সবেগে দোদুল্যমান। নমস্তে এবং সেলাম আলায়কুমের পালা চলল বেশ কিছুক্ষণ ধরে। কিন্তু সহদেব এটা লক্ষ্য করতে ভুললেন না যে উজিরের চোখের কোণে অশনি-সংকেতই বুঝি দেখা যায় একটা। দু'দণ্ড তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে অনিবার্যভাবেই। যদিও রণধীর তাঁকে নিজের আসনখানিতেই বসিয়ে গিয়েছিলেন, রাণার কাছে যাওয়ার সময়। সে-সৌজন্যকে নিজের অভ্রভেদী মর্যাদার সম্যক্ স্বীকৃতি বলে তিনি মেনে নিতে পারেন নি।

সহদেব হিন্দুস্থানী জানেন। ওদিকে শাহাবাজও ও-ভাষা কিছু কিঞ্চিৎ শিখে নিয়েছেন এই দুই বৎসরে। বাবরশার স্পষ্ট আদেশ রয়েছে বড় ছোট সব কর্মচারীকেই এদেশের কথোপকথনের ভাষাটি সর্বাগ্রে শিখে নিতে হবে। "যার ভাষা জান না, তার মনের কথা কখনো বুঝবে না। যার মনের কথা বুঝবে না, সে তোমার অনুরাগী হবে না কখনো। আর অনুরাগ যেখানে নেই, সেখানে স্বতঃই এসে জুটবে বিরাগ এবং তা থেকে বিরোধ। আমি ভারতে স্থাপন করতে চাই শান্তির সাম্রাজ্য। যার ভিত্তিই হবে জনগণের সদিচ্ছা।"

কাজেই শাহাবাজের পক্ষে সহদেবের কথা না-বুঝতে পারার কোন কারণ নেই। কিন্তু বুঝতে তিনি পারছেন কি না-পারছেন, তা তাঁর আচরণ দেখে বোঝা যায় না। তিনি একদম নিশ্চুপ। বারকতক সেলাম-আলায়কুম উচ্চারণ করার পরে তিনি একদম মৌনী বাবা বনে গিয়েছেন। চোখের কোণের ঐ অশনি-সংকেতের সঙ্গে তাঁর এই মৌনব্রতকে জড়িয়ে জড়িয়ে সহদেব আঁচ করে নিলেন—উজির সাহেব মোক্ষম রকম চটে গিয়েছেন। অবশ্যই তিনি আসামাত্র তাঁকে কাঁধে করে রাজদরবারে নিয়ে যায়নি রণধীর। এই কসুরের দরুন ইচ্ছে করলে উজির চটতে নিশ্চয়ই পারেন।

সহদেব এখন ব্যগ্র, একটা ঝগড়াঝাঁটি বেধে

—"চলুন এইবার দয়া ক'র,..." [ পৃষ্ঠা ৪৪

যাওয়ার আগেই উজির সাহেবকে রাণার কাছে পৌঁছে দেবার জন্য। হাতাহাতি লড়াই, খোলা তরোয়াল নিয়ে হানাহানি। এইসব ভাল বোঝে রাজপুতেরা। বোঝে আপনজনের ভিতর হৃদ্যতা এবং সৌজন্যের আদান-প্রদানও। কিন্তু শত্রুর সঙ্গে শিষ্টাচারের বিনিময়, বিশেষ করে ওপক্ষ যখন প্রস্তরমূর্তির মত উদাসীন, সে যে বড় কঠিন ব্যাপার! কাঠখোট্টা রাজপুত ওতে অভ্যস্ত নয়।

"বড় কষ্ট দিলাম, রাজসভা অনেকটা দূর"—ইত্যাকার বাক্‌বিন্যাস একতরফাই কয়েক মুহূর্ত চালিয়ে গেলেন সহদেব। তারপর অতিকষ্টে বিরক্তি দমন করে ঘোড়ার দিকে আঙুল নির্দেশ

করলেন তিনি—"চলুন এইবার দয়া করে, রাজসভায় রাণা আপনার প্রতীক্ষায় আছেন।"

এতক্ষণে কথা ফুটল উজিরের মুখে। কথা ত নয়, কামানের যেন গোলাই ফাটল একটা। "আমিও ত রানার জন্য নিতান্ত অল্পক্ষণ প্রতীক্ষা করিনি এই ভাঙা দরোজায়!"

কয়েক মুহূর্ত বিস্ময়ে হতচকিত রাজপুতেরা। সহদেব ক্রুদ্ধ, কিন্তু সংযত। ওদিকে রণধীর ক্রুদ্ধ এবং চঞ্চল। ততোধিক চঞ্চল রণধীরের রক্ষী-দলের সৈনিকেরা। রাণার জন্য প্রতীক্ষা? রাণা সিংহাসন ছেড়ে ছুটে আসবেন এই সিংহদ্বারে দিল্লীর দূতকে সেলাম বাজাবার জন্য, এইটাই কি প্রত্যাশা ছিল নাকি এই উদ্ধত উজিরের?

কিন্তু শাহবাজ খাঁ এদিকে যতই ক্রোধন স্বভাবের লোক হোন না, ধূর্তও তিনি কম না। তাঁর হুংকারের প্রতিক্রিয়া যে তাঁর আশানুরূপ হয় নি, বরং উলটো দিকে চলে গিয়েছে একেবারে, তা এক মুহূর্তের মধ্যে তিনি সমঝে নিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গেই ক্রুদ্ধ কণ্ঠকে করে ফেললেন মোলায়েম। রক্তচক্ষুতে ফুটিয়ে তুললেন প্রসন্নতা। মিষ্টস্বরে বললেন—"পথশ্রমে ক্লান্ত সর্দারজি, আমি ত আপনার মত লড়ুয়ে লোক নই, খানুয়ার পরে আর ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হতে হয়নি। চলাফেরা হাতীতেই করি। রাণার মেহমান মঞ্জিলে একখানা চারপাই পেতে কতক্ষণে শুয়ে পড়তে পারব, তাই ভাবতে ভাবতেই আসছি সারাপথ। তাইতেই মেজাজটা—তা চলুন চলুন—"

কিন্তু চলবার জন্য শাহাবাজ যতই তাড়া দিন এখন, সহদেব তেমন বেশী তাড়াতাড়ি করছেন না ত! তিনি বরং রণধীরের কানে কানে কি যেন কথা কইছেন নিরিবিলি। আর ঐ রণধীর! সহদেবের কথা শেষ হওয়া মাত্র সে ঘোড়া ছুটিয়ে রওনা হয়ে গেল প্রাসাদের দিকে, আর সহদেব উজিরের দিকে ফিরে ভারতীয় কায়দায় জোড়হাতে নিবেদন করলেন—"আসুন তাহলে উজির সাহেব।"

নাঃ, তাড়াতাড়ি করবার পাত্রই নয় এই বুড়ো সর্দার। ঘোড়া চালিয়েছে ধীর কদমে। আর সে যখন পথপ্রদর্শক, একশোটা তুরুক সওয়ার সঙ্গে নিয়ে উজিরকেও সেই কদমেই চলতে হচ্ছে চিতোরের পথে। উজিরের কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে। চিতোরবাসী পথচরদের হাবে-ভাবে কৌতূহলের আভাসটুকু পাওয়া যাচ্ছে, ভয়ের বা সম্ভ্রমের আভাস তার অর্ধেকটুকুও না। তার মেজাজ আবারও তপ্ত হয়ে উঠছে।

দেরি বেশী হল না, সে-মেজাজ আবারও ফেটে পড়ল উত্তাপে। রণধীর সিং এসে দাঁড়াল পথের পাশে। সহদেব বললেন উজিরকে—"আপনার সহচর একশো সৈনিকের মধ্যে চারজন মাত্রই আপনার সঙ্গে থাকবে, এই বাকী পথটুকু। অন্য সবাইয়ের বিশ্রামের ব্যবস্থা হয়েছে এই দিককার খোমান মহলে। ওঁদের এই রণধীর সর্দারের সঙ্গে সেই মহলে যাওয়ার অনুমতি দিন।"

"কী? আমার সহচরেরা রাণার দরবারে প্রবেশের অধিকার পাবে না?" গর্জে উঠলেন উজির।

"কী করে পাবে উজির সাহেব? দিল্লী-দরবারের মত বৃহৎ জায়গা ত নয় আমাদের সভাগৃহ। ছোট দুর্গ, ছোট প্রাসাদ, ছোট সভা, সবই ছোট। চারজন সৈনিকসহ আপনাকে ঢোকাবার পথই সেখানে পাওয়া শক্ত হবে আমার পক্ষে। আগে থাকতে যাঁরা এসেছেন, তাদের ত বার করে দেওয়া যায় না!" মুখখানি অত্যন্ত কাঁচুমাচু বুড়ো সহদেবের। কিন্তু ভঙ্গী তাঁর অনমনীয়। উজিরের কোন জেদই যে চলবে না এ-ব্যাপারে, সেটা সহদেব স্পষ্ট বুঝিয়ে দিতে চান।

উজিরও মন স্থির করে ফেললেন মুহূর্তের মধ্যে। "সভায় ওদের ঠাঁই হবে না যখন, খোমান মহলে

বা বেইমান মহলে, কোথাও ওদের গিয়ে দরকার নেই। আপনি মেহেরবাণী করে অনুমতি দিন, ওরা এই পথের পাশেই ঘোড়ার পিঠে অপেক্ষা করুক এক দণ্ড। আমি চারজন সহচর নিয়েই হোক বা নিছক একাকীই হোক, একবার গিয়ে দেখা করে আসি রাণার সঙ্গে, তারপর আমি ওদের নিয়ে চিতোরের বাইরে চলে যাব এখন। আপনাদের এখানে স্থানাভাব যখন এমন তীব্র, কাজ কী আছে ঝঞ্ঝাট বাড়াবার ?"

শাহবাজ খাঁর উদ্ধত আচরণে এই ভাবটাই ক্ষণে ক্ষণে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে চাইছিল, যেন মেবার বাবরশার কাছে ইতিমধ্যেই দাসখত লিখে দিয়েছে, এবং বাবরশার প্রতিনিধি যেন ইতিপূর্বেই মেবারের দণ্ডমুণ্ডের মালিক বনে গিয়েছেন।

যা হোক। এরকম অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে মেবারীদের করণীয় যে কী, সেটা স্থির করবার ভার সহদেব সর্দারের উপরে নেই। সুতরাং শাহাবাজকে ত্বরিতে সেইখানে নিয়ে যাওয়া দরকার। রাণা যেখানে স্বয়ং সশরীরে উপস্থিত। তিনি সব দেখুন, শুনুন, তারপর স্থির করুন ইতিকর্তব্য।

শাহাবাজের ইচ্ছানুযায়ী কাজই হল। তুর্কী সওয়ারেরা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল সামরিক কায়দায়, যেন যে-কোন মুহূর্তে তারা প্রত্যাশা করছে শত্রুর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার আদেশ এক্ষুণি বেরিয়ে পড়বে উজিরের মুখ থেকে।

থাকুক ওরা, ছেয়ানব্বুইটা তুর্কীর একটা সমাবেশ দেখে ঘাবড়ে যাওয়ার পাত্র মেবারী রাজপুতেরা নয়। সহদেব চললেন রাজসভায় উজিরকে নিয়ে। উজির বাঁকা চোখে লক্ষ্য করলেন, সেই অনামুখো রণধীর এবারও আগে ভাগে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে, রাণাকে খবর দেওয়ার জন্য।

উজির সভায় উপস্থিত হয়ে দেখেন—অবাক

"—আসুন তাই, উজির সাহেব !" [ পৃষ্ঠা ৪৪৬

কাণ্ড! সিংহাসনে রাণা নেই। দেওয়ান মহীন্দর রাওয়ল হাসিমুখে এগিয়ে এলেন দুই হাত মেলে, এবং দুই চোখে মেকী উল্লাস ফুটিয়ে—"কী সৌভাগ্য! কী সৌভাগ্য! মেবার ধন্য হল শাহানশাহ দিল্লী সুলতানের অযাচিত বান্ধবতার এই পরিচয় পেয়ে। বসুন, রাণার সম্মুখের এই আসনে।"

হস্তীদন্ত-খচিত একখানি কাষ্ঠাসন উজিরের দিকে এগিয়ে দিয়ে রাওয়ল আবারও নিবেদন করলেন—"গুরুতর প্রয়োজনে রাণাকে কয়েক মুহূর্তের জন্য নিভৃত মন্ত্রণাকক্ষে যেতে হয়েছে। এই তিনি এলেন বলে—"

"প্রয়োজনটা আর কিছুই নয়, দিল্লীর দূতকে হেয় প্রতিপন্ন করা। আমি আসছি, এটা জেনেও রাণা যদি সভায় আর এক দণ্ড অবস্থান করতে না পেরে থাকেন, তবে তাঁর ফিরে আসার জন্য আমি আর অপেক্ষা করব না। গুরুতর প্রয়োজন আমারও আছে দিল্লীতে। যে-বার্তা বহন করে আমি আজ এসেছিলাম, তা আপনাদেরই জানিয়ে যাচ্ছি। জানি যে রাণার কানে তা যথাযথই পৌঁছোবে। শাহানশাহ বাবরশাহা চেয়েছিলেন অকৃত্রিম বান্ধবতার হস্ত মেবারের দিকে প্রসারিত করতে। খানুয়ার যুদ্ধের ফলাফল যদি এখনও রাণা মনে রেখে থাকেন, তবে তিনি অবশ্যই, নাম-মাত্র রাজকর প্রদানের ভিত্তিতে, সে বান্ধবতা ক্রয় করতে ইচ্ছুক হবেন। যদি না ইচ্ছুক হন—"

রাওয়ল স্তব্ধ, ইন্দ্রভান শূরমল্ল, শঙ্কল সিং প্রমুখ অতিথিবর্গও স্তব্ধ। স্তব্ধ সভারক্ষী সৈনিকদের কটিবদ্ধ অসি—

বাধ্য হয়েই উজিরকে নিজের কথা নিজেই শেষ করতে হল—"যদি না ইচ্ছুক হন, একশো তুড়ুক সওয়ার আজ চিতোরের সিংহদ্বার দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে যাবে বটে, কিন্তু অচিরেই বিশ হাজার সওয়ার সেই সিংহদ্বার দিয়েই ফিরে আসবে, এবার আর নিঃশব্দে নয়, 'দিন, দিন' রণহুঙ্কার তুলে।"

"আসুন তাই, উজির সাহেব! আপনি যদি সেই বিশ হাজার সওয়ার নিয়ে চিতোরের দ্বারে কোনদিন পৌঁছোতে পারেন—"

কথা কইছেন স্বয়ং রাণা রত্ন।

"যদি চিতোরের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছোতে পারেন কোনদিন, দেখবেন সে-দ্বার রুদ্ধ নয়। আপনি সসৈন্যে প্রবেশ করতে পারবেন দুর্গে, বিনা প্রতিরোধেই পারবেন। আজ থেকে চিতোরের দ্বার আর চিতোরের নয়, আরাবল্লীর গিরিসংকটে। খানুয়ার মাঠে আমরা হেরেছিলাম, কিন্তু মেবার সীমান্তের পাহাড়ে আমরা হারব না।"

নিষ্ফল ক্রোধে অর্ধোন্মাদের মত উজির যখন সানুচর বেরিয়ে গেলেন সিংহদ্বার দিয়ে, তাঁর পশ্চাতে নাকাড়া বাজিয়ে ঘোষক হেঁকে উঠল—"চিতোরের এই দ্বার আর কোনদিন রুদ্ধ হবে না। যার শক্তি থাকে, আসুক সে-শত্রু, এখানে তাকে বাধা কেউ দেবে না। বাধা যা পাওয়ার, তা সে পাবে দেবির আর হলদিঘাটায়।"

সব কথা যখন বাবর শা শুনলেন, শাহাবাজ খাঁকে উজিরি থেকে অপসারিত করলেন তদ্দণ্ডে—"যুদ্ধই যদি করব, তাহলে যেচে দূত পাঠাতে যাব কেন? আমি চেয়েছিলাম বীর শত্রু সঙ্গের পুত্রকে স্নেহের বন্ধনে বাঁধতে। রাজকরের কথাটা তুমি সাঁ করে তুলতে গেলে কেন?"

এরপর আর দুই বৎসর মাত্র বেঁচেছিলেন বাবর, দুইবার অভিযান পাঠিয়েছিলেন মেবার অভিমুখে। রত্ন রাণা মিছে বড়াই করেননি। সে-সব অভিযান আরাবল্লী অতিক্রম করতে পারেনি। হুমায়ুন বাদশা কোন অভিযানই পাঠাতে পারেননি। অভিযান পাঠিয়েছিলেন আকবর শা, রত্নের তিরোধানের প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে মানসিংহ-প্রমুখ রাজপুত রাজন্যবর্গেরই আনুকূল্যে।

সে-অভিযান প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়েছিলেন রাণা প্রতাপ। কিন্তু ব্যর্থ হয়েও প্রমাণ করেছিলেন তিনি সঙ্গ রাণা রত্ন রাণার সুযোগ্য বংশধর।

## ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য

এক দেশে এক রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র ও কোটালপুত্র ছিল। তাদের তিনজনের খুব ভাব। এক সঙ্গে খাওয়া, এক সঙ্গে বসা, এক সঙ্গে বেড়ানো। সবাই বলে 'আহা! এমন মিল দেখা যায় না।' একবার তিন বন্ধু দেশভ্রমণে বেরিয়েছে। অতি সাধারণ পোশাকে বেরিয়েছে। টাকাকড়িও বিশেষ সঙ্গে নেয়নি—পাছে চোর ডাকাতে কেড়ে নেয়। তবে রাস্তায় যদি হঠাৎ কিছু টাকার দরকার হয় তো কি করবে? সেইজন্যে রাজপুত্র একটি সোনার মোহর নিজের মাথার বড় বড় চুলের ভেতর লুকিয়ে রেখে তাতে পাগড়ী বেঁধে নিল। যাতে কেউ না টের পায়।

তিন বন্ধু দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কত নদ-নদী, গিরি-বন-উপবন ঘুরে বেড়ালো তার হিসেব নেই। অবশেষে সমুদ্রের মাঝে এক ছোট্ট দ্বীপে এসে পৌঁছোলো। ওরা যেখানে যেখানে রাত্রি-বাস করেছে, সেখানে সেখানে সকলে পালা করে রাত জেগে পাহারা দিত। রাত্রির তো চারটি প্রহর। প্রথম প্রহরে তারা তিনজনেই জেগে পাহারা দেবে। দ্বিতীয় প্রহরে মন্ত্রিপুত্র জেগে পাহারা দেবে, তৃতীয় প্রহরে রাজপুত্র ও চতুর্থ প্রহরে কোটাল-পুত্র জেগে পাহারা দেবে। এই সোনাই দ্বীপেও সেইভাবেই পাহারার ব্যবস্থা হল।

একদিন সকালে উঠে রাজপুত্র ছাখে তার মাথার ভেতর সে মোহর নেই। কি সর্বনাশ! কি হবে? এই বিদেশে এসে এ কি বিপদ হল? কি করে বাড়ি ফিরবো? সঙ্গে যা ছিল তা সব খরচ হয়ে গেছে, এখন উপায়? রাজপুত্র বললেন, ছাখো ভাই, তোমরা মনে কিছু করো না—একটা সত্যি কথা বলবো? এ মোহর কোন বাইরের চোর চুরি করে নি। আমাদের তিনজনের ভেতর কেউ নিয়েছে। আমার মাথার চুলের ভেতর মোহর আছে, এ কথা বাইরের কেউ তো জানে না! তার উপর আমরা সকলেই পালা করে জেগে

পাহারা দিয়ে এসেছি। তখন তিন বন্ধুই নিজের নিজের কাপড় জামা ঝাড়লো—কারও কাছে মোহর নেই।

মন্ত্রিপুত্র বললে, চলো, এদেশের রাজার কাছে যাই—তিনিই বিচার করে আমাদের মোহর উদ্ধার করে দেবেন। রাজপুত্র বললেন, কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব বজায় রেখে তবেই সে মোহর চাই। যদি সামান্য মোহরের জন্য আমাদের বন্ধুত্ব ভেঙ্গে যায় তো কাজ নেই এমন মোহর নিয়ে।

তারা এইরকম পরামর্শ করে রাজদরবারে গিয়ে উপস্থিত হল। রাজাকে সব ঘটনা খোলাখুলি ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হল এবং বললো, মহারাজ! আমাদের অকৃত্রিম বন্ধুত্বে যেন আঁচড় না লাগে অথচ মোহর পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করুন।

রাজা বললেন, তা কি করে সম্ভব? বন্ধুত্ব বজায় রাখতে গেলে মোহর পাওয়া যাবে না। কারণ মোহর পেতে গেলে একজন বন্ধুর বন্ধুত্ব হারাতেই হবে।

রাজপুত্র বললো, না মহারাজ! আমি একটি বন্ধুকেও হারাতে চাই না—মোহর না পাওয়া যায় সে-ও ভাল।

মন্ত্রিপুত্র বললো, মহারাজ! আমরা মোহরও চাই, বন্ধুত্বও চাই—সেই ব্যবস্থা আপনি করুন। সেই জন্যেই আপনার কাছে এসেছি।

বৃদ্ধ মন্ত্রী উঠে বললেন, এ মীমাংসা এখানে হতে পারে না। একটি দেশ আছে। সে দেশের সিংহাসনে এক রাজকুমারী বসেন, কিন্তু রাজা পরিচালিত হয় এক ময়না পাখির দ্বারা। পাখিটি শুনেছি খুব জ্ঞানী। অনেক দুরূহ মামলার নিষ্পত্তি তাঁর বিচারেই হয়। চমৎকার বিচার।

এ কথা শুনে তিন বন্ধু সেই দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। কিন্তু কেউই বলতে পারে না, কোন্ দেশের সিংহাসনে রাজকুমারী বসেন, আর শাসনকার্য চলে ময়না পাখির নির্দেশে।

তিন বন্ধুর বড় কষ্টে দিন যেতে লাগলো। কারণ টাকা-পয়সা কিছুই কাছে নেই। যদি কেউ দয়া করে কিছু খেতে দিল তো খেলে—নয়তো ডাহা উপোস। শরীর পথশ্রমে ক্লান্ত ও ক্ষুধায় অবসন্ন। বেশভূষাও তথৈবচ। সবই প্রায় ছিঁড়ে এসেছে। একদিন বনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। একটা পুরোনো বটগাছের তলায় রাত্রিটা থাকবার ব্যবস্থা করলো। তৃতীয় প্রহরে রাজপুত্র যখন জেগে পাহারা দিচ্ছিল, সেই গভীর রাত্রে শুনতে পেলো সেই গাছেরই ডালে বসে এক ব্যাঙ্গমা ও ব্যাঙ্গমী গল্প করছে।

ব্যাঙ্গমী বলছে, ব্যাঙ্গমা, আর কতদিন আমার বাছা অন্ধ হয়ে থাকবে? এর কি কোন উপায় নেই? একটি মাত্র বাছা, তা-ও অন্ধ। ভগবান! আর কত কষ্ট দেবে?

ব্যাঙ্গমা বলছে—এক সাধু এ গাছতলায় রাত্রে ছিলেন। তিনি আমাদের দুঃখের কথা জানতে পেরে বলেছিলেন—হ্যাখো ব্যাঙ্গমা, রাজরক্ত যোগাড় করতে পারো? রাজরক্ত তোমার ছেলের চোখে দিলে তোমার অন্ধ ছেলের চোখ হবে। তবে খাঁটি রাজরক্ত চাই। যাঁর চৌদ্দ পুরুষ যথার্থ রাজচক্রবর্তী রাজা ছিলেন—তাঁরই দেহে খাঁটি রাজরক্ত আছে।

ব্যাঙ্গমী বললে, সে রক্ত কি তুমি যোগাড় করতে পারো না?

ব্যাঙ্গমা বললে, খুবই মুশকিল। কারণ কোনও রকমে দুটো পয়সা করে কেউ সিংহাসনে বসলেই তার শরীরে যথার্থ রাজরক্ত থাকে না। খাঁটি রাজরক্ত কোথায় পাবো?

রাজপুত্র গাছতলায় বসে তাদের কথোপকথন শুনলো। মনে মনে ভাবলো আমার চোদ্দপুরুষ

তো রাজা ছিলেন, আমার রক্ত পক্ষিশাবকের চোখে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলে কি হয়! যদি চোখ ভাল হয়ে যায়!

ভোরে ঐ ব্যাঙ্গমা ও ব্যাঙ্গমী চরতে বেরিয়ে গেল। রাজপুত্র ইত্যবসরে ঐ গাছের ডালে উঠলো। পাখির বাসা দেখতে পেলো। পাখিটা মানুষের গন্ধ পেয়ে ভয়ে কর্কিয়ে কেঁদে উঠলো। রাজপুত্র তরোয়াল দিয়ে নিজের আঙ্গুল একটু কেটে ফেললো। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতে লাগলো। সেই রক্তে পাখি রাঙা হয়ে গেল। তার চোখে মুখেও রক্ত পড়লো। সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলো। পাখি চেয়ে দেখলো সামনে এক রূপবান যুবক।

পক্ষিশাবক বললো, তুমি নিশ্চয়ই রাজপুত্র। তুমি আমার চক্ষুদান করলে। কে তুমি?

রাজপুত্র বললো, আমি একজন গরিব ভবঘুরে। সর্বস্ব হারিয়ে বড় কষ্টে পড়েছি। আমি এক দেশের সন্ধানে বেরিয়েছি—যে দেশের সিংহাসনে রাজকুমারী বসেন, আর শাসনকার্য চালায় এক জ্ঞানী ময়না পাখি।

পক্ষিশাবক বললে, তোমার যখন বড়ই অভাব, আমার এই খেলনাগুলো নিয়ে যাও। শুনেছি এগুলো খুব দামী। বিক্রী করলে অনেক টাকা পাবে। আমি একলা একলা থাকি বলে বাবা আমায় এগুলো এনে দিয়েছেন খেলবার জন্য। এবার তো আমার চোখ ভাল হয়ে গেছে। এগুলো আর দরকার নেই। রাজপুত্র দেখলো, ওগুলো হীরে-মতি চুনি-পান্না। আমি একটি মোহরের জন্য এত ভাবছি, এগুলো বেচলে কত মোহর হবে তার ঠিক নেই। কিন্তু রাজপুত্র নিল না। বললো—দেখো ভাই, উপকার করে তার দাম নিতে নেই। তুমি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছ এতেই আমার আনন্দ, পরিবর্তে কিছুই চাই না।

এমন সময় ঐ ব্যাঙ্গমা ও ব্যাঙ্গমী বাচ্চার জন্য কিছু খাবার নিয়ে বাসায় ফিরে এল। বাচ্চাটা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে বললো, ও বাবা! ও মা! এই দেখো আমার চোখ ভাল হয়ে গেছে, আমি তোমাদের দেখতে পাচ্ছি। এই গরিব বেচারা নিজের আঙুল কেটে আমার চোখে রক্ত দিয়েছে। আহা গরিব লোক! আমি আমার সব খেলনা হীরে মানিক সব দিতে চাইলুম, নিল না।

ব্যাঙ্গমা বললো, ওরে আমার বাচ্চা সোনা! তুই অবোধ, কিচ্ছু জানিস না। এ গরিব নয়—ছদ্মবেশী রাজপুত্র। সাধারণ মানুষ হলে, এ সব হীরেমতি কি ছেড়ে দিত? তার ওপর, রাজপুত্র না হলে, তার রক্তে তোর চোখ ভাল হল কি করে?

রাজপুত্র বললো, তুমি ঠিকই বলেছ—আমি একদেশের রাজপুত্র। রাত্রে তোমাদের কথোপকথন শুনেছিলুম। তাই আজ সকালে ওর চোখে রক্ত দিয়েছিলুম।

ব্যাঙ্গমা বললো, রাজপুত্র! আপনি কোথায় যাবেন বলুন, আমি আপনাকে পিঠে করে পৌঁছে দোব।

রাজপুত্র বললেন, আমি একা নই—আমরা তিন জন আছি। আমি যে জায়গায় যেতে চাই সে জায়গা আমার জানা নেই। শুনেছি সেই দেশের সিংহাসনে এক রাজকুমারী বসেন, আর রাজ্যের বিচার করে এক ময়না পাখি।

ব্যাঙ্গমা বললে, আমার সমস্ত দেশ নখদর্পণে। আমি জানি সে দেশ সমুদ্রের ওপারে। আপনি আমার পিঠে বসুন, আমি পৌঁছে দিচ্ছি।

রাজপুত্র বললেন—আমি একা নই আমরা তিন বন্ধু।

ব্যাঙ্গমা বললে, বেশ ভাল কথা! আপনারা তিন জন আমাদের তিনজনের পিঠে উঠে বসুন—

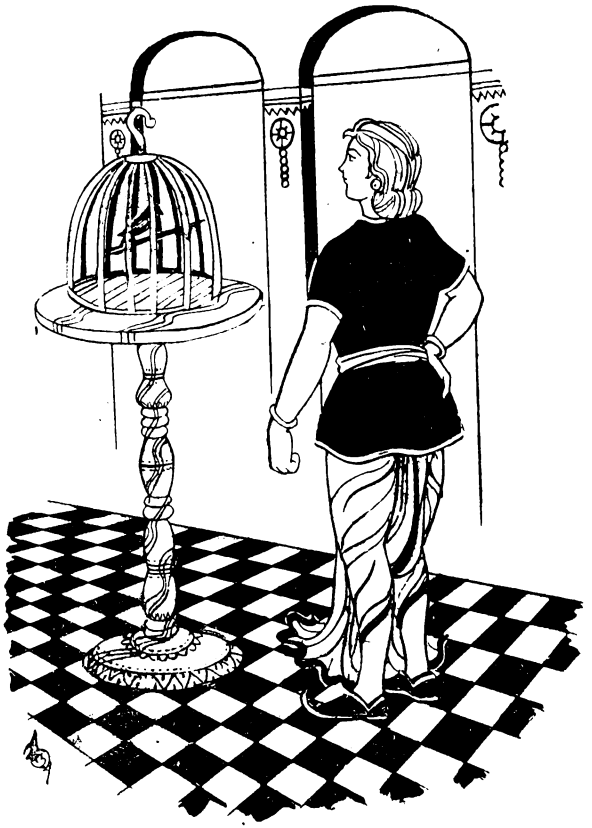

পাখি প্রথমেই ডেকে পাঠালো রাজপুত্রকে।

এখনই পৌঁছে দিচ্ছি। তিন বন্ধু তিনটি পাখির পিঠে বসল। তারা সমুদ্রের ওপর দিয়ে তীর বেগে ছুটে চললো। অবশেষে সেই রাজ্যে এনে পৌঁছে দিল। তিন বন্ধু সে রাজ্যের রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে দেখলো সিংহাসনে রাজকুমারী তাঁর পাশেই একটা সোনার খাঁচাতে ময়না পাখি।

রাজপুত্র চুরির কাহিনী সব রাজকুমারীকে বললো এবং বিচার প্রার্থনা করলো। তবে এমন-ভাবে বিচার করুন যাতে আমাদের বন্ধুত্ব অটুট থাকে, আর মোহরটিও পাওয়া যায়।

রাজকুমারী ময়না পাখিকে বললেন, হে জ্ঞানী ও গুণী পক্ষী! আপনি চুরির কাহিনী তো সব শুনলেন। কি ভাবে বিচার হবে বলুন!

ময়না পাখি বললো, এর বিচার প্রকাশ্য রাজ-সভায় হওয়া সম্ভব নয়। একটা নির্জন কক্ষে এক এক করে তিন বন্ধুকে ডাকবো—এক সঙ্গে নয়।

সোনার খাঁচা চলে গেল এক নির্জন কক্ষে। পাখি প্রথমেই ডেকে পাঠালো রাজপুত্রকে। রাজপুত্র একা এল। পাখি বললো; আপনাকে একটি গল্প বলি, মন দিয়ে শুনুন। এই গল্পটি শুনে, আমি যা প্রশ্ন করবো তার উত্তর দেবেন। তারপরে আমি বিচার করবো। পাখি গল্প বলে চললো :—

এক দেশে এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যা ছিলেন। তিনি রোজ সকালে গঙ্গাস্নান করতে যান। একদিন গঙ্গাস্নান করে বাড়ি ফিরছেন, এমন সময় পথিমধ্যে এক কুষ্ঠব্যাধি ভিখিরি তাঁর কাছে ভিক্ষে চাইলো। রাজকন্যা তাকে কিছু পয়সা দিতে গেলেন, কিন্তু ভিখিরি তা নিল না। ভিখিরি বললো, আমি অন্য কোন ধনদৌলত চাই না। আমি যা চাই, তাই যদি দিতে পারেন, তবেই আপনার ভিক্ষা নোব, নচেৎ নয়।

রাজকন্যা বললেন, বলো তুমি কি চাও? সাধ্য থাকলে নিশ্চয় তা পূরণ করবো।

ভিখিরি বললো—আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই, আমার বৌ হবেন?

রাজকন্যা বললেন—আমি এক রাজপুত্রের বাগ্‌দত্তা বধূ। আমি আমার বাগ্‌দত্তা স্বামীর অনুমতি না নিয়ে তোমায় বিয়ে করতে পারি না।

ভিখিরি এই উত্তর শুনে নিরাশ হল। বললো, ভালই হয়েছে, আপনি যখন রাজপুত্রের নিকট বাগ্‌দত্তা, তাঁকেই বিয়ে করুন। কারণ আপনার ভরণ-পোষণের সামর্থ্য আমার নেই। তবে একদিন এক রাত্রের জন্য আমার বৌ হয়ে আমার সেবা করুন, এই আমার আকাঙ্ক্ষা। আমার এই ইচ্ছা কি পূরণ হবে না?

রাজকন্যা চিন্তিত হলেন। কারণ গঙ্গাস্নানের

পর প্রথম প্রার্থীকে তিনি বিমুখ করতেন না। সে যে ভিক্ষাই চায় তিনি তাই দিয়ে থাকেন। এ কথা ঐ ভিখিরি জানতো। তাই এই অন্যায় আবদার করেছিল।

যথাসময়েই ঐ রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল। বাসর-ঘরেই রাজকন্যা রাজপুত্রকে ঐ কুষ্ঠব্যাধি ভিখিরির সঙ্গে প্রতিশ্রুতির কথা জানালেন। রাজকন্যা বললেন, তুমি যদি সেই কুষ্ঠব্যাধি ভিখিরির ক্ষণকালের জন্য স্ত্রী হয়ে তার সেবা করবার আদেশ দাও, তবেই আমি তার কাছে যাবো। তোমার আদেশ না পেলে যাবো না। তবে কিছুক্ষণের জন্য আমায় ছেড়ে দিতে হবে। কারণ তাকে কথা দিয়েছি এ সংবাদটা তাকে দিয়ে আসবো।

রাজপুত্র বললেন, এখুনিই যেতে হবে?

রাজকন্যা বললেন, হ্যাঁ, এই রাত্রেই। রাজপুত্র কিছুক্ষণ নীরব থেকে কি ভাবলেন। পরে বললেন, তুমি যখন কথা দিয়েছ অবশ্যই যাবে এবং সে যদি তোমায় কিছুক্ষণের জন্য স্ত্রী হয়ে সেবা করতে বলে, তুমি তা করতে পারো, আমার আপত্তি নেই।

বধূবেশী রাজকন্যা আদেশ পেয়ে চললেন সেই কুষ্ঠব্যাধি ভিখিরির ইচ্ছা পূরণ করতে। তাঁর সর্বাঙ্গে নববধূর সোনা ও জড়োয়ার গহনা, বিবাহের বেনারসী শাড়ি, ললাটে কনে চন্দন চর্চিত। ঢলঢল লাবণ্যময়ী ধীর পদে রাস্তা আলো করে চলেছেন। যেন স্বর্গের অপ্সরী মর্ত্যধামে হেঁটে চলেছেন। পথে এক হিংস্র বাঘ কোমল নধর নরমাংসের লোভে রাজকন্যার পথ আগলে দাঁড়ালো।

রাজকন্যা হাতজোড় করে বাঘকে বললেন, হে ব্যাঘ্র মহারাজ? তিষ্ঠ ক্ষণকাল। আমি এখন সত্য রক্ষা করতে চলেছি, এই পথ দিয়েই ফিরবো কথা দিচ্ছি, তখন তৃপ্তির সহিত আমায় ভক্ষণ করো, কোন আপত্তি করবো না।

বাঘ বললে, ছাখো কথা দিচ্ছি। মনে রেখো আমি তোমার প্রতীক্ষায় এখানে বসে রইলুম।

আবার কিছুদূর যেতে যেতে দেখলেন এক চোর চুরি করতে যাচ্ছে। রাজকন্যার গায়ে অত গয়না দেখে তার লোভ হল। ভাবলে কোথায় সিঁদকাঠি নিয়ে ঘুরে বেড়াবো? কিছু পাবো কি পাবো না, তার ঠিক নেই। তার চেয়ে এই রাজকন্যার গয়নাগুলো মেরে দিতে পারলে, চুরি করবার প্রয়োজন হবে না। সারাজীবন পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খাবো। চোর সামনে এসে সব গয়নাগুলি দাবি করলো।

রাজকন্যা বললেন, শোন চোর! তোমায় কথা দিচ্ছি আমি সত্য পালনের জন্য এই রাত্রে একা বেরিয়েছি, এখুনিই এই রাস্তা দিয়েই ফিরবো। তখন স্বেচ্ছায় আমার সমুদয় গহনা তোমায় খুলে দোব। কিছুক্ষণের জন্য এখানে অপেক্ষা করো।

চোর বললো, আমি আপনাকে বিশ্বাস করলুম। আমি এখানেই অপেক্ষায় রইলুম।

অবশেষে সেই কুষ্ঠব্যাধি ভিখিরির পর্ণকুটীরের দ্বারে এসে পৌঁছোলেন। বললেন, এস ভিখিরি! তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে স্বামীর অনুমতি নিয়ে সরাসরি বাসরঘর থেকে তোমার কাছে চলে এসেছি, ক্ষণকালের জন্য তোমার স্ত্রী হয়ে সেবা করবো।

সেই গভীর নিস্তব্ধ নিশীথে ভিখিরির মাটির ঘরের দোরে আকাশের চাঁদ যেন এসে দাঁড়িয়েছে। এ যেন করুণাময়ী সাক্ষাৎ জগজ্জননী ভিখিরির দোরে এসে দাঁড়িয়েছেন। ভিখিরি হাত জোড় করে স্তব আরম্ভ করে দিল 'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ নমো নমঃ'। মা, মা, দয়াময়ী! এই পাপীকে উদ্ধার করতে কি কৈলাস পর্বত হতে নেমে এলি মা। যদি এসেছিস মা, যদি দয়া করেছিস, একবার

বাঘ অবাক্ হয়ে চোখ কপালে তুললো।

দাঁড়া! ঐ রাতুল চরণে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করি। জীবন সার্থক হোক। মা, আমায় ক্ষমা কর মা। আমায় আশীর্বাদ করে যাও।

রাজকন্যা ভিখিরিকে আশীর্বাদ করে আবার স্বামীর বাসরঘরে ফিরে চলেছেন। পথে দেখেন সেই চোর তখনও বসে আছে। রাজকন্যা গায়ের সব গয়না খুলে চোরকে দিতে গেলেন, বললেন এই নাও বাবা, তোমাকে কথা দিয়েছিলুম এই গয়না তুমি নাও। চোর হাত জোড় করে কেঁদে বললো, মা! মা! আমি মহা পাপী, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। স্বেচ্ছায় চোরের হাতে গয়না তুলে দিতে এসেছ? মা! তুমি মানুষ নও দেবী, আমায় ছলনা করো না মা! আজ থেকে আমি চুরি করা ছেড়ে দিলুম।

এইবার সেই বাঘের সঙ্গে দেখা। রাজকন্যা বললেন, বাঘমশাই! আমি কথা দিয়েছি—সেই-জন্য আবার তোমার কাছে এলুম। আমাকে ভক্ষণ করে তৃপ্ত হও। কী আশ্চর্য! বাঘ অবাক্ হয়ে চোখ কপাল তুললো। বলে কি?

বাঘ বললে, 'মা! বাঘের মুখ থেকে বেঁচে গিয়ে কথা দিয়েছে বলে কেউ ফিরে বাঘের সুমুখে এসে হাজির হয়, জীবনে এই প্রথম দেখলুম। মা! তুমি সামান্য মানবী নও, নিশ্চয়ই কোন দেবী, আমায় ছলনা করতে এসেছ। তোমায় খেয়ে কি শেষে বিপদে পড়বো! এ মাংস কি হজম হবে? পেট ফেটে মরি আর কি! যাও মা! উপোস করে মরবো—তবু, ও পবিত্র মাংস ছোঁব না। বাঘ রাস্তা ছেড়ে চলে গেল। রাজকন্যা বাসরঘরে ফিরে স্বামীকে প্রণাম করলো।

ময়না গল্প শেষ করে বললো, বলো তো রাজপুত্র, ঐ বাসরঘরের নতুন রাজপুত্র বর, ক্ষুধার্ত বনের পশু, আর সেই লোভী চোর এই তিনজন হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও রাজকন্যাকে ছেড়ে দিয়েছিল। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

রাজপুত্র বললেন, রাজপুত্র বর।

ময়না বললে, কেন?

রাজপুত্র বললে, রোজ সকলেই পেট ভরে খায় সুতরাং খাওয়ার লোভ ত্যাগ করা বাঘের পক্ষে এমন কিছু আশ্চর্য নয়। সোনাদানা গয়না গাঁটির প্রলোভন ত্যাগ করাও চোরের পক্ষে খুব এমন আশ্চর্য নয়—কারণ চোরের জীবনে সেইটাই শ্রেষ্ঠ সম্পদ নয়। কিন্তু রাজপুত্র নববধূকে সত্য পালনে সাহায্য করে যে মহত্ত্ব দেখিয়েছে তার তুলনা নেই। সত্য ও ধর্ম রাখতে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বার্থ বলিদানে রাজপুত্র পরাঙ্মুখ হয় নি।

ময়না বললো, চমৎকার! যথার্থ তুমি রাজবংশের পরিচয় দিয়েছ। আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পারো। তোমার মন্ত্রিপুত্র বন্ধুকে পাঠাও।

মন্ত্রিপুত্র এল। ময়না তাকেও সেই একই গল্প শোনালো। তারপর জিজ্ঞাসা করলো, বলো দেখি এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? কার ত্যাগস্বীকার প্রশংসার যোগ্য?

মন্ত্রিপুত্র বললো, বাঘের ত্যাগ স্বীকার সবচেয়ে বড়।

ময়না জিজ্ঞাসা করলো, কেন?

মন্ত্রিপুত্র বললো, ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়। পৃথিবীর প্রত্যেকটি জীব ক্ষুধার অন্বেষণে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে। সেই লোভনীয় ক্ষুধার সামগ্রী নিজের কবজার ভেতর পেয়েও যে ছেড়ে দেয়, তার প্রশংসা না করে পারা যায় না।

ময়না হেসে বললো, বুঝলুম মন্ত্রিপুত্র, খাওয়া পেলে তুমি আর কিছুই চাও না—তুমি একটি ডাকসাইটে পেটুক। এইবার তোমাদের কোটাল-পুত্র বন্ধুটিকে পাঠাও।

কোটালপুত্রকেও ঐ গল্পটি শুনিয়ে ময়না জিজ্ঞাসা করলো, বলো দিকিনি, কার ত্যাগ সব থেকে শ্রেষ্ঠ?

কোটালপুত্র বললো, এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে হবে চোরের চেয়ে ত্যাগ স্বীকার কেউ করে নি। এ সংসারে অর্থবলই সবচেয়ে বড় বল। যত মহৎ গুণই লোকের থাকুক, যার পয়সা নেই, তার কিছুই নেই। একজন সামান্য চোর অত টাকার গহনা হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও যে ছেড়ে দিয়েছে এত বড় লোভ যে ত্যাগ করতে পারে সে-ই মহৎ। এর ত্যাগের তুলনায় রাজপুত্র অথবা বাঘের ত্যাগের কোন মূল্যই নেই।

ময়না বললে, চমৎকার বলেছ। এ সমস্যার মীমাংসা তোমার কথাতেই হয়ে গেছে। আমার বুঝতে বাকী রইল না—মোহরটি তুমিই চুরি করেছ। বাপধন! চুপি চুপি মোহরটি এনে আমার খাঁচায় দিয়ে যাও। আমি তোমার বন্ধুদের বলবো না। মোহর তারা পেয়ে যাবে অথচ কেউ জানতে পারবে না—কে চুরি করেছিল। তোমাদের বন্ধুত্বও পূর্বের মত অটুট থাকবে।

কোটালপুত্র চুপি চুপি মোহরটি বার করে ময়না পাখির খাঁচায় দিয়ে দিল।

ময়না বললো এইবার তুমি বাইরে যাও, ভৃত্যদের বলো যেন আমার খাঁচা রাজসভায় নিয়ে যায়। ভৃত্যরা এসে খাঁচা নিয়ে গেল। ময়না বললো, এই নাও তোমাদের মোহর। কার কাছে পাওয়া গেছে তা বলবো না। আশা করি তোমাদের বন্ধুত্ব ঠিকই থাকলো। সুবিচার হল তো? সকলেই খুশী হল।

অতঃপর ময়না বললো, এই রাজকন্যাই এ রাজ্যের রানী। আর এই রাজপুত্র অতি মহৎ। যথার্থ রাজরক্ত এঁর দেহে আছে। আমি প্রস্তাব করছি আমাদের রাজকন্যার সঙ্গে এই রাজপুত্রের বিয়ে হোক। কি বলেন আপনারা? কারণ এই কন্যার পিতা মৃত্যুর পূর্বে বলে গিয়েছিলেন, যাঁর শরীরে যথার্থ রাজরক্ত আছে তাঁর সঙ্গেই তাঁর কন্যার বিয়ে হয়। আপনারা আমার প্রস্তাব সমর্থন করুন। সকলেই সমস্বরে বললো—সমর্থন করলুম?

তারপর কি হল বলো দিকিনি? তারপর শাঁখ বাজলো। শাঁখের সুরে সুর মিলিয়ে সানাই বেজে উঠলো। রাজপুত্র রাজকন্যাকে বিয়ে করে বন্ধুদ্বয়সহ মায়ের ও বাপের কাছে গিয়ে আশীর্বাদ চাইলো।

দার্জিলিংএর ঝড়ের রাত। ঝড়ের সাথে ঝরছে বৃষ্টি। মুহুর্মুহুঃ গর্জে উঠছে বাজ। যেন এই মুহূর্তে পৃথিবীকে করবে ধ্বংস। সেই দুর্যোগের মাঝে উদ্ভ্রান্তের মত ছুটে চলেছে এক তরুণী......
উঃ, আর পারছিনা! কিন্তু যেমন করেই হোক, আমাকে পৌঁছাতেই হবে! ওঃ, আর কতদূর!
কালো বাঘের থাবা
ওই গাছটা পেরুলেই রাস্তা।
কিন্তু রাস্তা পেরিয়েই ধাক্কা খেলো তরুণী!
উঃ, মাগো!
1

ছিটকে পড়ে তরুণী
পিছনে তাকিয়ে দেখল...
উঃ! ওকে!!
আরে আরে! একি এত হীরে চুনী নিয়ে কোথায় যাচ্ছ খুকি?

হিঃ হিঃ, আজকার মুখ দেখে উঠেছি!

ত্রস্ত তরুণী বাক্সটি নিয়ে ছুট দিল....
হিঃ হিঃ!
বাঁচাও!

চুয়ান্ন নম্বরে দেখা হবে সুন্দরী!

তরুণীটি প্রাণপণে ছুটে এসে....
৫৪
এই তো! এই তো চুয়ান্ন নম্বর বাড়ি!

## শতদল ভট্টাচার্য

উল্টোডাঙা স্টেশন থেকে কয়েক পা এগিয়ে এলে সল্ট লেকের কিনারা যা বাস রাস্তার ধারে এসে পড়েছে সেখানে দেখা যাবে একটি সুন্দর প্রেক্ষাগৃহের মত বাড়ি। বিরাট ফটক। চারিদিকে নানা গাছ সমেত বাগান। বাগানটায় ঢোকবার জন্যে বাস রাস্তা থেকে সোজা গেট পর্যন্ত চলে গেছে সুন্দর পথ। পথের দুধারে অসংখ্য নিয়ন বাতি। বাড়িটার মাথায় বড় বড় অক্ষরে লেখা "বিধান শিশু উদ্যান"। রাত্রিবেলা লেখাটা নিয়নের আলোয় জ্বলজ্বল করতে থাকে। অনেক দূর থেকে দেখতে পাওয়া যায় সে লেখা। দেখতে পাওয়া যায় আলোয় ঝলমল করছে বিধান শিশু উদ্যানের বাড়িটি। উল্টোডাঙা স্টেশন দিয়ে যেতে যেতে চলন্ত ট্রেনের যাত্রীরা মনে করে কি আছে ওর ভেতর? একদিন দেখে যেতেই হবে।

এবার গেট পেরিয়ে ভেতরে যাওয়া যাক। ওমা! ভেতরটা আরও সুন্দর। বাইরে থেকে তো বোঝা যায় না এত জিনিস রয়েছে এখানে। ৬৪ বিঘা জমি নিয়ে বাগানটি গড়ে উঠেছে। তার মধ্যে ২০ বিঘা জুড়ে আছে একটি মনোরম সরোবর। নাম বিধান সরোবর। এখানে সাঁতার ও নৌকো চালান শিখবে ছেলেরা। গেট দিয়ে ঢুকেই বাঁ-দিকে সেই বাড়িটা যার মাথায় লেখা "বিধান শিশু উদ্যান"। হাজার হাজার লোককে যে বাড়ি দূর থেকে নিত্য আকর্ষণ করছে।

দেখা যাক কি আছে বাড়িটায়। কয়েকটা সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠলেই যা সবার আগে চোখকে তৃপ্তি দেবে তা হল দেওয়ালে টাঙান কতকগুলো হাতে আঁকা ছবি, নানা বিষয় নিয়ে। সবই প্রায় ছোটদের আঁকা, একটি দুটি বড়দের আছে। এক পাশে রয়েছে একটি একোয়ারিয়াম। একোয়ারিয়ামের পাশেই অফিস ঘর। কর্মীরা মিষ্টি ব্যবহার এবং সুন্দর কথাবার্তায় অভ্যস্ত। এনাদের সঙ্গে কথা বলে জানলাম মাইনে এমন কিছু বেশী পান না, কোন স্কেল নেই, অনারারিয়াম হিসেবে টাকা পান। আসলে এঁরা শিশু উদ্যানকে ভালবেসে কাজ করছেন। অফিস ঘরের পাশেই ব্যায়ামাগার। এখানে শরীর-চর্চার

নানারকম সরঞ্জাম রয়েছে। আরও অনেক সরঞ্জাম আনার ব্যবস্থা হচ্ছে। ব্যায়ামাগারের সামনে ইন্‌ডোর অডিটোরিয়াম। শিশু উদ্যানের ভারপ্রাপ্ত সুব্রতবাবু সুন্দরভাবে ধীরে-সুস্থে সব দেখাচ্ছিলেন। বললেন চারশ দর্শকের বসবার জায়গা এখানে রয়েছে, তবে আরও একশ আসন বাড়ান যেতে পারে এবং আশা করছি তার ব্যবস্থাও হবে। প্রেক্ষাগৃহটি সুন্দর, বিশেষ করে মঞ্চটি, মঞ্চতে জায়গা অনেক।

প্রেক্ষাগৃহের পাশে আছে লাইব্রেরী ঘর। খাসা লাইব্রেরীটি। এখন বইয়ের সংখ্যা পাঁচ হাজার। ছোটদের কাজে লাগে এমন সব বিষয়ের ওপরই বই রয়েছে। অবশ্য বড়দের উপযোগীও কিছু কিছু সাহিত্য সংস্কৃতি বিজ্ঞান বিষয়ে বই রাখা হয়েছে। এখানে এমন কিছু বই দেখলাম যা কলকাতার ন্যাশানাল লাইব্রেরীতেই একমাত্র আছে। প্রচুর বই, দামী দামী বই। শিশুদরদী ব্যক্তিরা এই বইগুলো দান করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক প্রকাশক সমিতির কর্মকর্তারা আগেই ঘুরে গেছেন। এই লাইব্রেরী দেখে তাঁরা খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন, বলেছেন যখন যে বই শিশু ও কিশোরদের জন্যে প্রকাশিত হবে উপহার স্বরূপ লাইব্রেরীকে তা পাঠিয়ে দেবেন। সুব্রতবাবুই বললেন এ খবর। লাইব্রেরীর সভ্যসংখ্যা এখন তিনশ।

লাইব্রেরীর সামনের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এলাম। এখানে আছে কেবল রিডিং রুম। ছোটরা বিনা পয়সায় এখানে বসে বই পড়তে পারে। এখানে কিছু পাঠ্যপুস্তকও আছে। একশ জন ছেলেমেয়ের বসে পড়াশুনো করার মত জায়গা আছে এখানে। পড়ুয়াদের মোট সংখ্যা পাঁচশ।

রিডিংরুম সংলগ্ন ছাদটি মুক্তির স্বাদ এনে দেয়। পড়তে পড়তে ক্লান্তি এলে পড়ুয়া এখানে এসে একটু বৈচিত্র্য উপভোগ করে থাকে। এই ছাদ থেকে ঝিলসমেত শিশু উদ্যানের অনেকখানিই দেখা যায়।

দোতলা থেকে নেমে ঝিলের ধার ধরে ধরে এগোতে লাগলাম। ছোটরা যা যা ভালবাসে এখানে তা পেয়ে যাবে। এপারে আছে দোলনা, সি স, ছোট বড় স্লিপ আরও কত কি! একটা নতুন জিনিস দেখলাম—গাছের ডালে ঝোলান দড়ির মই। এগুলো ডানপিটে ছেলে মেয়েদের জন্যে। তখন প্রশ্ন হল কারা ডানপিটে? যারা বিনা দ্বিধায় এই মইতে চড়তে দৌড়ে আসবে, তারাই ডানপিটে, তাই না? বাগানের মাঝখানে একটি সুন্দর ফোয়ারা। চারপাশে ঘিরে থাকা একটা গোল চৌবাচ্চায় ফোয়ারার জল পড়ছে। তাতে ছোট ছোট রঙিন মাছ খেলে বেড়াচ্ছে। মহাভীতু শিশুও এখানে এসে বীরত্ব দেখায়। ছোট ছোট মাছদের কাছে ওদের যত বীরত্ব। ফোয়ারার কাছে আছে আউটডোর রঙ্গমঞ্চ। দর্শকরা দেখবে বাগান থেকে। আর আছে খেলাধুলোর জন্যে মস্ত মাঠ। খেলাধুলো শেখার সভ্যসংখ্যা এগারোশর মত।

বিধান শিশু উদ্যানের মোট সভ্যসংখ্যা এখন প্রায় ১৯০০। লাইব্রেরীতে ৩০০, পাঠাগারে ৫০০ এবং ক্রীড়া বিভাগে ১১০০। এখনও সভ্য হওয়ার জন্যে অনেক দরখাস্ত জমা হয়ে আছে, সেগুলোকে ক্রমশঃ বিবেচনা করা হবে। বাগানে মরশুমী ফুলের চাষও করা হচ্ছে।

এ তো গেল ঝিলের এপারের খবর। ওপারে আছে ধানের গোলার আকারে দুটো ঘর। এখানে হবে 'হবি সেণ্টার'। শেখান হবে ছবি আঁকা, বেতের কাজ ও অন্যান্য ক্র্যাফট্স। এদের পাশে করা হয়েছে পিকনিক হাউস। একসঙ্গে তিনশ ছেলেমেয়ের রান্না-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে এখানে।

বিধান শিশু উদ্যানকে পূর্ণ রূপ দিতে গেলে প্রয়োজন বহু অর্থের। অথচ এই শহরে এমন একটি শিশু উদ্যানের প্রয়োজন খুবই। কলকাতায় অনেক আগেই এমন একটি শিশু উদ্যান গড়ে ওঠা উচিত ছিল। বিধান শিশু উদ্যানের কোন প্রবেশমূল্য নেই যা থেকে বাঁধা একটি আয় হতে পারে। তা ছাড়া সভ্যদের কাছ থেকে মাসে মাসে চাঁদা

নেওয়ারও কোন প্রথা নেই। পাঁচ থেকে চোদ্দ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা এখানকার সভ্য। সভ্য হবার সময়ে সেই যে পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়ে ঢুকল ব্যস, চোদ্দ বছর পর্যন্ত আর চাঁদা লাগবে না। এটা কি কম কথা? শিশু উদ্যানের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থের প্রায় সবটাই এসেছে বিধান মেলা থেকে। জনসাধারণ সামান্য কিছু ডোনেশান দিয়েছে।

১৯৬২ সালে ৪ঠা জুলাই ডাঃ বি. সি. রায় মেমোরিয়াল কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতে ঠিক হয় ২০০ শয্যাবিশিষ্ট বিধান রায় শিশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পর যদি উদ্বৃত্ত টাকা থাকে তাই দিয়ে একটি শিশু উদ্যান করা হবে। শিশু হাসপাতালের পর ১৯৬৮ সাল ১৪ই নভেম্বর পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর জন্মদিনে কলকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের কাছ থেকে যোগাড় করা ৬৪ বিঘা জমিতে সেই সময়ের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যশোবন্ত রাও চৌহান বিধান শিশু উদ্যানের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। বিধান শিশু উদ্যানের জন্যে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই বিধান মেলার আয়োজন করা হয়। ১৯৭৫ সালে ১লা থেকে ১৬ই জুলাই বিধান মেলা চলে। ১৯৭৬ সালে ১লা ফেব্রুয়ারী বহু প্রতীক্ষিত এই শিশু উদ্যানের উদ্বোধন হল। উদ্বোধন করলেন মাননীয় রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আমেদ।

ভারতের কয়েকটি জায়গায় ইতিপূর্বেই শিশু উদ্যান তৈরী হয়েছে। অনেকখানি জায়গাও তারা পেয়েছে। কিন্তু কলকাতায় অতখানি জায়গা শিশু উদ্যানের জন্যে কোথায় পাওয়া গেল? আয়তন ও বয়সের দিক দিয়ে বিধান শিশু উদ্যান সর্বকনিষ্ঠ। কিন্তু আয়োজনের দিক দিয়ে এই উদ্যান যে কোন শিশু উদ্যানকে ছাড়িয়ে গেছে। কোন্ শিশু উদ্যানে এমন সুন্দর লাইব্রেরী ও ফ্রি রিডিং রুম আছে? কোথায় আছে ইনডোর ও আউটডোর দু দুটো অডিটোরিয়াম, হবি সেণ্টার? ভবিষ্যতে অন্য দেশের শিশু উদ্যানে এবার থেকে এগুলো হয়তো যুক্ত হবে কিন্তু বিধান শিশু উদ্যানই এই পরিকল্পনা ও তার রূপায়নে প্রথম হয়ে রইল।

আবারও মহামতি গোখেলের কথা সত্যি প্রমাণিত হল "বাংলা আজ যা ভাবে সমগ্র ভারত কাল তা ভাববে।"

---

## ফাঁদ দেখেছে

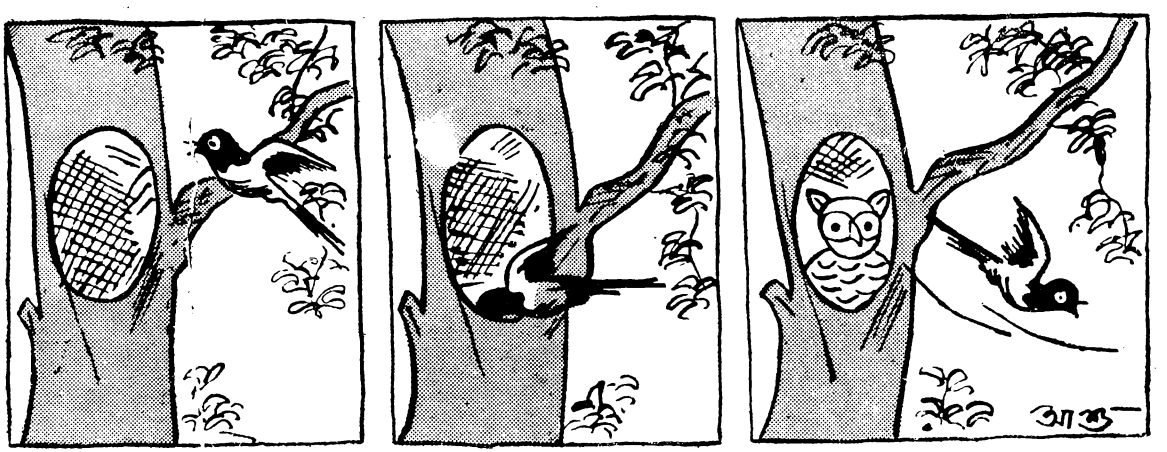

# হাঁদা ভোঁদার

## জোড়াদার

আশ্চর্য! দ্যাখ্ হাঁদা, সামনের বাড়ীর নতুন ভাড়াটের ছেলেটা অবিকল তোর মতো! একেবারে জুড়ি!
তাইতো রে!

এ যে আমার জোড়া আসছে — আর ওখানে রয়েছে কুঁদুলে কেষ্টা! একটু মজা করি!
উফ্! কে, কার কম্ম এটা?

এটা তাহলে তোর কাজ শুঁটকো মার্কট হাঁদা! তুইই ঢিল মেরেছিস! এই নে পাটকেল!
ওফ্! কি-কিন্তু আমি
কোন কৈফিয়ৎ শুনতে চাই না!
হিঃ হিঃ! আমার হয়ে আমার জোড়া-ই ধোলাই খাচ্ছে!

তৈরি থাক! শয়তান হাঁদাটা একলা গলিপথ দিয়ে আসছে। ওর উপযুক্ত অভ্যর্থনা করছি।
হেঃ হেঃ! ওরা আমার বদলে আমার জোড়াকে দেখেছে।

আফ্! এ কি হচ্ছে? থামাও!
থামবো কিরে, এই তো সবে সুরু করেছি!
হাঃ হাঃ! জোড়ার খেল বেশ ভালোই জমছে রে ভোঁদা!

আমার বাগান খুঁড়ে দিবি বলেছিলি! কথামতো ঠিক সময়েই এসেছিস হাঁদা! খোঁড়া হয়ে গেলে দেখবি আমিও তোকে একটা জিনিস দেবো।
অ্যাঃ! আহ্ — হ্যাঁ
ওহ্! ব্যাপারটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, কিন্তু আমার জোড়াদার নিজেই পরিশ্রমের কাজের জায়গায় এসে হাজির!

উফ্! আমি কখন বাগান খোঁড়ার কথা দিয়েছিলাম, আর আমাকে হাঁদা হাঁদা করছে
কেন কিছুই বুঝতে পারছি না!
হিঃ হিঃ!

ধন্যবাদ হাঁদা! তোকে একটা জিনিস দেবো বলেছিলাম– এই নে চকোলেট ক্রীম কেক!
উঃ! ভোঁদারে দ্যাখ ও কি জিনিস পাচ্ছে! ওটা ওর কাছ থেকে বাগাতে হবে!
কি চমৎকার জিনিস!
ওর পিছু নিয়ে ওর সঙ্গে দোস্তি পাতাবো, তারপর আধখানা কেক হাতাবো!
যা ইচ্ছে কর, আমি চললুম!
এই যে ঠিক চিনেছি! সেদিন তুই-ই আমার শার্ট টিল মেরে ফাটিয়েছিলি!
না-না আমি না– অপজ্!
কাল আমার ভাইয়ের কান টেনেছিলি– এই তার বদলা!
উঃ! সে আমি নয়!
হাঁদা, তোকে যে অতো বড়ো ক্রিম কেকটা দিলুম, সেটা গোটাটাই খেয়ে ফেলেছিস? কি পেটুক ছেলে রে!
আমি সব শুনেছি হাঁদা! এখন যদি তোকে আমি বড় এক ডোজ ক্যাস্টর অয়েল না দিই তবে তুই অসুস্থ হয়ে পড়বি!
ক্যাস্টর অয়েল
কি রে হাঁদা? খুব ঘন ঘন দৌড়চ্ছিস যে। কেকের প্রতিক্রিয়া না কি রে?
বেশী কথা বলার টাইম নেই, শুধু জেনে রাখ যে, কেউ মনে করেছে আমি সে! আবার অন্য কেউ মনে করেছে সে আমি আর তাইতে আমার এই দশা!

"সুকোমল সেনগুপ্ত স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য়
প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

# রঙ্গ দেখ বিশ্বনাথের

## অপর্ণা চট্টোপাধ্যায়

সে এক দারুণ মজার গল্প! ওই যে গো—চেনো না তাঁকে—সেই ইয়া জটা মাথায়, ইয়া মোটা ভুঁড়ি, দুটো চোখ তো আছেই—আরো একখানা ঠিক কপালের মাঝখানটিতে। ধবধবে সাদা গায়ের রঙ, কী সুন্দর দেখতে! এই রে—চিনে ফেলেছ তো! হ্যাঁ গো, ঠিক ধরেছ, ব্যোম্ ভোলানাথ শিবের কথাই বলছি। জানোই তো তাঁর কাজ কি! ত্রিশূল বাগিয়ে, ডমরু বাজিয়ে, 'রাম' নাম করে নেচে বেড়ানোই তাঁর কাজ। আর মা দুর্গা! উরে ব্বাস্‌রে! উনি তো সব সময়ই রণচণ্ডী হয়েই আছেন! সিংহের পিঠে চড়ে, দশ হাত বের করে, এলোকেশী মা ঘুরে ঘুরে দত্যি-দানব মেরেই বেড়াচ্ছেন। ঘরসংসার করবেন আর কখন!

শিব ভাবলেন—"ধুর! আমি বেড়াই নেচে নেচে, চণ্ডীর যায় দিন অসুর মেরে। তবে আর বাড়ি ঘর করে পয়সা নষ্ট করি কেন?" সাত-পাঁচ ভেবে কৈলাসেই বাস করবেন স্থির করলেন তিনি। সারাদিন নেচে নেচে যখন ক্লান্ত, তখন বাবা ভোলানাথ বাঘছাল বিছিয়ে বসে পড়েন কৈলাসের চূড়ায়। আর মা দুর্গার হাত যখন ব্যথা হয়ে যায় অসুর মেরে মেরে, (শত হলেও মেয়েমানুষ তো বটে!) তখন তিনি শিবের কাছে এসে বসে দুদণ্ড জিরিয়ে নেন। আর সেই ফাঁকে শিবের ষাঁড় আর চণ্ডীর সিংহ দুজনে মিলে নেচে কুঁদে কৈলাস তোলপাড় করতে থাকে।

একদিন কী হয়েছে জানো তো? শিব আর দুর্গা বিশ্রাম করছেন কৈলাস পর্বতের শিখরে বসে। এমন সময় হঠাৎ শিবের মাথায় কী খেয়াল চাপল। লাফ দিয়ে উঠে ষাঁড়ের পিঠে চড়ে বসলেন। মা দুর্গা তো অবাক্! বললেন—"তোমার হল কী হঠাৎ? অমন লাফিয়ে উঠলে যে বড়?"

মহাদেব বললেন—"বসে থাকতে আর ভাল লাগছে না গৌরী। তার চেয়ে বরং মর্ত্যে একটু বেড়িয়ে আসা যাক্, ওই মানস সরোবরের ধারে-কাছেই এক চক্কর দিয়ে আসি। বেশী দূর গেলে আবার ভুঁড়ি নিয়ে—"।

ফিক্ করে হেসে ফেললেন মা ভবানী। তারপর নিজেও সিংহের পিঠে উঠে বললেন—"বেশ, চল। অনেকদিন মর্ত্য দেখিনি। ছেলে মেয়েরা কী করছে দেখে আসি গিয়ে।"

শিব পার্বতীকে নিয়ে বৃষ আর সিংহ মর্ত্যে নামল। হরিদ্বার, হৃষিকেশ পেরিয়ে হেঁটে চলেছে দুই মূর্তিমান। এমন সময় বিপরীত দিক থেকে আসছিলেন এক শান্ত, সৌম্য, জটাজূটধারী মুনি। কমণ্ডলু হাতে নিয়ে আপন মনে ভগবানের নাম করতে করতে চলেছেন মুনিবর। সামনেই শিব পার্বতীর বাহন দুটি এগিয়ে আসছে, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই তাঁর। এদিকে ষাঁড় বাবাজীই কী কম ত্যাঁদড়! মুনিকে যে পথ করে দেবে তা নয়, দুম্ করে দিয়েছে এক ধাক্কা। মুনি তো রেগে মেগে কাঁই! কিন্তু শিবের বয়েই গেছে মুনির রাগ দেখতে! যেই না বৃষের সাথে মুনির ধাক্কা লেগেছে, অমনি শিব ত্রিশূলের এককোপে কপাৎ করে কেটে ফেললেন মুনির মাথা।

দেখে শুনে পার্বতী তো ভয়েই অস্থির! প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন—"হায়! হায়! মহাদেব! তুমি ভগবান হয়ে এমন অপকর্ম করলে! ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ! কী করে তুমি উদ্ধার পাবে? তোমার যে অনন্ত নরকবাস। হায়! হায়! এ কী হল

গো!" বলেই না মা দুর্গা চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। আর তাই দেখে শিবের সে কি হাসি! হো হো! হা হা! হি হি! ব্যোম্ ভোলানাথের হাসি আর থামতেই চায় না। শঙ্করের অমন অট্টহাসি দেখে শঙ্করী থ! বললেন—"বাঃ! ব্রহ্মহত্যা করে তুমি হাসছ? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?"

গিরীশ হেসে বললেন—"কী মজা করি দেখই না।" বলেই বৃষের পিঠে চড়ে এগিয়ে গেলেন। দুর্গাও চললেন সাথে সাথে।

এদিকে কি হয়েছে! ভগীরথ শঙ্খধ্বনি করতে করতে মা গঙ্গাকে নিয়ে আসছিলেন স্বর্গ থেকে মর্ত্যে। ভগীরথের পিছু পিছু জাহ্নবী যখন কলকল ছলছল শব্দে নাচতে নাচতে হরগৌরীর কাছাকাছি এসে পড়েছেন, তখন শিব একগাছি কুশ নিয়ে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে নিজের গায়ে ছিটালেন। আর এক ফোঁটা জল শিবের গায়ে পড়তেই শিব ব্রহ্মহত্যার মহাপাপ থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন। তাই দেখে অন্নপূর্ণা আশ্চর্য! বিস্ময়ে বিস্ফারিত-নেত্রে শিবের মুখপানে চেয়ে বললেন—"এ কী অলৌকিক মহিমা ভাগীরথীর! এক ফোঁটা গঙ্গাজলেই ব্রহ্মহত্যার পাপ বিনষ্ট হল!"

বিশ্বনাথ হেসে বললেন—"দেখলে তো পতিত-পাবনী গঙ্গার কী অপরূপ মাহাত্ম্য! আমি কিন্তু গঙ্গাতীর ছেড়ে কৈলাসে আর ফিরছি না!" বলেই বিশ্বনাথ তাঁর চারদিকে পাঁচ ক্রোশ জায়গা জুড়ে গণ্ডী টেনে দিলেন। অন্নপূর্ণাকে বললেন—"আজ থেকে এই জায়গার নাম হবে বারাণসীধাম। অপর নাম কাশী। আমরা এখানেই বিরাজ করব অনন্তকাল। কাশীতে যারা মরবে, তাঁদের তারকব্রহ্ম নাম দিয়ে আমি করব উদ্ধার। আর ক্ষুধার্ত নরনারীকে তুমি দেবে অন্ন।"

অন্নপূর্ণা মধুর হেসে বললেন—"তাই হবে বিশ্বনাথ। বিশ্বকর্মা তবে রচনা করুক মন্দির কাশীধামে।"

শিব একগাছি কুশ নিয়ে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে নিজের গায়ে ছিটালেন।

দেব-কারিগর বিশ্বকর্মা নির্মাণ করলেন অপূর্ব সুন্দর স্বর্ণখচিত শ্বেতপাথরের মন্দির। বিশ্বনাথের মন্দিরে সেই থেকে বাস করছেন মা অন্নপূর্ণা আর বাবা। জগৎবাসীর ক্ষুধা দূর করবার জন্য আশুতোষ স্বয়ং ভিখারী সেজে অন্নপূর্ণার কাছে অন্ন ভিক্ষা করেন। শঙ্কর-শঙ্করী শুধু দেহের ক্ষুধাই মেটান না। মুমূর্ষু মানুষকে দেন অমৃত সুধা, মুক্তিফল। তাই তো বারাণসীধাম সকলের প্রিয়, আত্মার আত্মীয়।

তোমরা কাশী যেয়ো। দেখো হর-পার্বতীকে। আর গঙ্গায় স্নান করতে ভুলো না যেন, কেমন? বল দেখি—ব্যোম্ ভোলানাথ!

"৺সুকোমল সেনগুপ্ত স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য়
দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

# অলৌকিক

শ্রীআলোক বাগচী

পুণ্যভূমি কাশীধাম। সেই প্রাচীন কাল থেকে এই পুণ্যভূমির স্পর্শ লাভ করে ভাগীরথীর সবেগ ধারায় অবগাহন করে কত যে শোকসন্তপ্ত মানব-প্রাণ ধন্য হয়েছে, কত মন যে নব উদ্দীপনায় জেগে উঠেছে, কত অসুস্থ যে এখানে এসে ধরনা দিয়েছে, শুধু মাত্র দু'দণ্ড শান্তি লাভের আশায়, তা আর বলে শেষ করা যায় না। এমনই মাহাত্ম্য এই কাশীধামের। আর তাই তো যুগে যুগে কত মহাপুরুষ, কত সাধক তান্ত্রিকের লীলাভূমি এই স্থান। তাঁদের ভক্তি প্রেম, তাঁদের জীবনকথা আমাদের কাছে এক অত্যাশ্চর্য বিষয়।

না না, ভয় নেই। আমি এখানে এই পুণ্য-ধামের মাহাত্ম্য কীর্তন করতে বসছি না। সেরকম কোন ইচ্ছাই আমার নেই। আমি এই বারাণসী-ধামের কয়েকটি ঘটনার কথা বলছি। যাকে বলে অসম্ভব, অবাস্তব।

পুণ্য কাশীধামের পবিত্র শ্মশানঘাট। ঘাটে দাহ করবার জন্য এক মৃত ব্রাহ্মণের শবদেহ আনা হয়েছে। নিঃসন্তান ব্রাহ্মণটির সাথে তাঁর পতিব্রতা স্ত্রীও এসেছে, ইচ্ছে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাবে। মহা ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করছিল পতিপ্রাণা স্ত্রী বারাণসীর পবিত্র শ্মশানঘাটে। মৃত পতির সহগামিনী হবে, লাভ করবে অক্ষয় পুণ্য—আনন্দময় স্বর্গ। বিশেষ করে এই কাশীধামে দেহ রাখলে। কারণ লোকে বলে, এখানে এসে দেহ রাখলে নাকি সশরীরে স্বর্গ লাভ হয়।

মৃত স্বামীর শবদেহ শ্মশানে রেখেছে গাউনিরা। মনে হচ্ছে যেন ঘুমোচ্ছে। এখনি ঘুম ভাঙবে। বলবে, চল, আমার সঙ্গে সহমরণে এসে দুজনে যাই স্বর্গে।

এমনি সময় স্ত্রীলোকটি শুনতে পেল, কে যেন পিছন থেকে তাকে ডাকছে। কণ্ঠস্বরটি যেমনই গম্ভীর ঠিক তেমনই মিষ্টি। পিছনে তাকিয়ে দেখল এক জ্যোতির্ময় পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন তার সামনে। এই রকম দিব্য অলৌকিক মূর্তি দেখে স্ত্রীলোকটি যেন একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। বার বার প্রণাম জানাল মনে মনে।

ধীরে ধীরে সেই মহাপুরুষ এগিয়ে এলেন স্ত্রীলোকটির দিকে। মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই এখানে কেন এসেছিস? মরতে?

এক অস্বাভাবিক শোকজ্বালায় হৃদয় মথিত করে স্ত্রীলোকটি আছড়ে পড়ল মহাপুরুষের চরণতলে। বললে, সংসারে আমার কেউ নেই। আমার সবেধন নীলমণি স্বামী ছিল। তাঁরও যাবার সময় হয়ে গেছে। আমি এখন সম্পূর্ণ একা। আপনার জন বলতে কেউ নেই।

দুঃস্থা শোকানলদগ্ধা স্ত্রীলোকটির কাতর প্রার্থনা শুনে মহাপুরুষের অন্তর করুণায় আর্দ্র হয়ে উঠল। প্রকাশ পেল তাঁর পবিত্র লীলা-মাধুরী। বাঁ পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে তিনি মৃত ব্রাহ্মণটির নাভি স্পর্শ করলেন। ব্রাহ্মণটিও তার প্রাণ ফিরে পেল। এতক্ষণ যে মরণের পারে চলে গেছিল, সে আবার নবজীবন লাভ করল।

স্ত্রীলোকটি তো বিস্ময়ে অবাক্! এ কি! এ কেমন করে সম্ভব হল।

মহাপুরুষের শ্রীচরণে আহত বিটপীর মত পড়ে

গেল। গদগদ কণ্ঠে বললে,—বাবা, তুমি সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ। না হলে এমন হয়? সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ তখন সহাস্যে স্থান ত্যাগ করলেন।

এই মহাপুরুষের পরিচয় আন্দাজ করতে পার? অতুলনীয় এই পুণ্যধামে বিশ্বনাথ শ্রীশ্রীতৈলঙ্গস্বামীর অপার করুণা-বলে সেদিন এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল।

আরেকটা ঘটনার কথা বলি। স্বামীজী তখন বারাণসীতেই রয়েছেন।

একদিন সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একটি লোক এখানে এসেছে গঙ্গাস্নান করতে। ভীষণ কাশছে লোকটি। লোকে বলছে, ওর যক্ষ্মা হয়েছে। তাই তো সে এখানে এসেছে। যদি কিছুমাত্র পুণ্যার্জন করতে পারে, তবে তার জীবনটা ধন্য হয়ে যায়।

স্বামীজী গঙ্গাতীরে আহ্নিক করছিলেন। দেখলেন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে সীতানাথ। বারংবার বক্ষদেশে শীর্ণ হাত দুটি বোলাচ্ছে। বেদনাক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখ আর অনুজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে মাঝে মাঝে করুণ নয়নে সামনের দিকে তাকাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে বলছে, তুমি কৃপা কর ঠাকুর। এ অধমকে কৃপা কর।

তৈলঙ্গস্বামী সেখানে গেলেন। দেখলেন সীতানাথকে। বললেন, এই নে গঙ্গামাটি। গঙ্গাস্নান করে এটা খেয়ে নিস।

বহুদিনের দুঃসাধ্য ক্ষয়রোগ। নানারকম চিকিৎসা করেছে সীতানাথ। এবার মহাপুরুষের কৃপায় হয়তো রোগ সারবে। গভীর বিশ্বাস নিয়ে গঙ্গাস্নান করে সে সেই গঙ্গামাটি খেল।

কি আশ্চর্য! কিছুদিন পর যথারীতি সে আরোগ্যলাভ করল। রোগ সেরে যাবার পর

—এই নে গঙ্গামাটি। গঙ্গাস্নান করে খেয়ে নিস।

প্রতিদিন স্বামীজীর কাছে এসে চরণ বন্দনা করতে লাগল। সেবা-শুশ্রূষায় প্রাণ মন ঢেলে দিল।

কাশীধামের এহেন তৈলঙ্গস্বামীর সম্বন্ধে আরও অনেক আজব ঘটনার কথা শোনা যায়।

তিনি নাকি বারাণসীর এক ঘাটে গঙ্গায় ডুব দিতেন, উঠতেন গিয়ে অনেক দূরে আরেক ঘাটে।

আরেকবার একটা মজার ঘটনা ঘটল।

স্বামীজী সর্বদা উলঙ্গ অবস্থায় পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। এতে একদল দুষ্ট প্রকৃতির লোক পুলিসের সাহায্য নিয়ে তাঁর পিছনে লাগল।

একদিন তারা তাঁকে এক সিন্দুকের মধ্যে আটকে রাখার পরিকল্পনা করল। একটি ছিদ্র-

বিশিষ্ট লোহার সিন্দুক তৈরি হল। পরে তারা সেটি নিয়ে তো স্বামীজীর কাছে এসে উপস্থিত।

স্বামীজী বোধ হয় সমস্ত ব্যাপারটাই আঁচ করতে পেরেছিলেন। তিনি ইতিমধ্যে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। সেদিন আর উঠলেনই না।

পুলিসের লোকেরা জলে জাল ফেলে স্বামীজীকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু পেল না।

ওরা হতাশ হয়ে ফিরে এল।

শুধু কি সেদিন? এরপর অনেককাল অতিবাহিত হল। এমন কি দীর্ঘ তিনমাস কেটে গেল।

তারপর হঠাৎ একদিন আবার তাঁকে দেখা গেল। তবে বারাণসীতে নয়, ত্রিবেণীতে। সেখানকার লোকেরা তাঁকে গঙ্গার উপর পদ্মাসনে বসে থাকতে দেখতে পেল।

একেবারে আকাশ থেকে পড়ার মতনই ব্যাপার। কি বল? জলের তলা দিয়ে বারাণসী থেকে একেবারে ত্রিবেণী!

এইরকম কত অবাস্তব ঘটনাই যে সেদিন বারাণসীতে ঘটত, সে এক মস্ত গল্প! সুযোগ পেলে আবার একদিন তোমাদের শোনাব সে সব ঘটনা।

---


ত্রিপুরার খোয়াই নিবাসী শ্রীদিলীপকুমার সাহা তাঁর পরলোকগত শিশুপুত্রের স্মৃতিরক্ষার্থে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতার প্রস্তাব করেছেন। তাঁর প্রস্তাব অনুসারে আমরা

**"৺সৌরভকুমার সাহা স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"**

নামে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা আহ্বান করছি।

প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু:

**সত্যের প্রতি নিষ্ঠা**

রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ: ৩১শে ভাদ্র, ১৩৮৩। প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা আগামী অগ্রহায়ণ সংখ্যা ১৩৮৩ শুকতারায় প্রকাশিত হবে।

**প্রথম পুরস্কার—১৫·০০ টাকা**

৺সৌরভকুমার সাহা
জন্ম: ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০
মৃত্যু: ২৫শে নভেম্বর ১৯৭৪

**দ্বিতীয় পুরস্কার—১০·০০ টাকা**

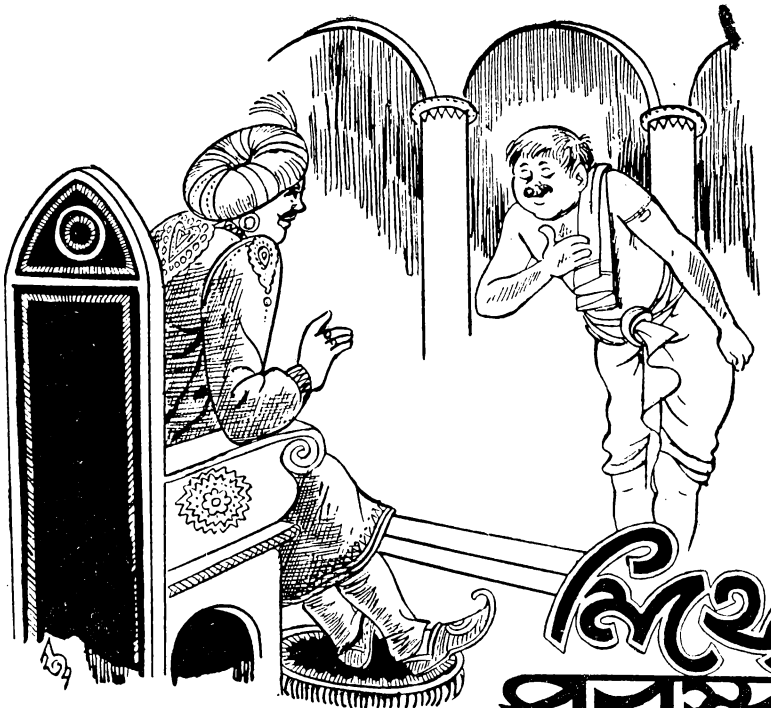

# মিথ্যে পুরস্কার

গৌতম চক্রবর্তী

বহুদিন আগেকার কথা। এক দেশে ছিল এক রাজা। একদিন মাথায় জাগল তাঁর এক বেখাপ্পা খেয়াল। তাই তিনি ঘোষণা করে বসলেন—যে লোক মিথ্যে কথা বলে প্রমাণ করতে পারবে তা মিথ্যে কথা, পুরস্কার-স্বরূপ তাহলে তাকে রাজ্যের অর্ধেকটা দিয়ে দেওয়া হবে!

রাজ্যময় ছড়িয়ে পড়ল ঘোষণা।

এই শুনে প্রথমেই রাজদরবারে এল এক দর্জী। সেদিন সকাল থেকেই টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সে বললে—'প্রভু, আপনার ঘোষণা শুনেই আসছি, কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেল, আসার পথে এক কাজ সারতে গিয়ে। কালকে খুব বৃষ্টি হয়েছিল তো, আর তাতেই বিদ্যুতের ধারে আকাশটা একেবারে দোচেলা হয়ে গিয়েছিল। এখন আসার পথে দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই সেলাই করতে বসে গেলুম। আর এই সেলাই করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। আমার এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য ক্ষমা করবেন প্রভু।'

রাজা বেশ সহানুভূতিশীল হয়েই উত্তর দিলেন—'ক্ষমা করার কী আছে! এ তো ভাল কাজ। কিন্তু তাড়াহুড়ো না করে সেলাইটি আরও ভাল করে করতে হয় ত। তাহলে আজ আর বৃষ্টি ঝরত না।'

দর্জী তার মিথ্যে কথা প্রমাণ করতে পারল না। মুখ নীচু করে বিদায় নিলে।

এবার এল এক রাখাল।

প্রণাম জানিয়ে বললে—'জানেন রাজাবাবু, আমার জীবনে যে ধরনের জিনিস দেখেছি, আপনি বোধহয় দেখেননি।'

রাজা বললেন—'কেমন ধারা?'

'আমার বাবার ছিল একটা বিরাট গদা। রাতের আকাশে যখন তারাগুলো মাঝে মাঝে এক জায়গায় গিজিগিজি হয়ে যেত, জম্পেশ করে বাবা তখন সেগুলোকে ওলোট-পালোট করে দিতেন সেই গদা দিয়ে।' বললে রাখাল—'আর তাই দেখে আমার যে কী মজাই না লাগত, সে আপনাকে কী বলব রাজাবাবু।'

রাজা তো এদিকে ভুরু কুঁচকে ঠোঁটের কোণে একটু ছোট্ট হাসি ঝুলিয়ে বললেন—'আরে ছোঃ! তোমার বাবার তবু গদা। আমার ঠাকুর্দার ছিল, জানো হে, একটি কল্কে। তা সেটা এমনধারা বড় ছিল যে, যখন তাতে আগুন ধরাবার দরকার হত, তখন তিনি সেটা সোজা সূর্যের কাছে দিয়ে দিতেন। সূর্য তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে তবেই ঠাকুর্দা আমার কল্কে টানতেন।'

রাখালের মুখ চুন। সেও তার মিথ্যে কথা রাজার কাছে প্রমাণ করতে পারলে না।

এবার এল হাঁটু অবধি কাপড় তোলা এলো গায়ে এক চাষী। সোজা চলে এল রাজদরবারে, লাঠি ঠুকতে ঠুকতে। বললে—'পেরনাম হই রাজামশাই।'

তা চাষীকে দেখে, চাষীর কথা শুনে রাজার হাসি পেল। আরে ফুঃ। কত রথীই এল আর গেল, তা এ ত এক সামান্য চাষী।

মনে মনে ভাবলেও রাজা কিন্তু মুখে বললেন—'তা কী মনে করে হে!'

চাষীটি বললে—'বলতে লাজ লাগছে রাজামশাই, অনেকদিন হল আপনি যে আমার কাছ থেকে পঁচিশ ভরি সোনা ধার করে এনেছিলেন, তা যদি আজ শোধ দিয়ে দেন বড় ভাল হয়। সামনেই নাতনীর বিয়ে।'

একঘর লোকের সামনে এ ধরনের অপমানজনক কথা শুনে তো রাজার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। তড়াক করে সিংহাসন থেকে লাফিয়ে উঠেই বললেন—'এ মিথ্যে কথা। তোমার মত সামান্য এক চাষীর কাছ থেকে সোনা ধার করতে যাব আমি? আমার কি সোনার অভাব? এই প্রহরী, একে ধরে নিয়ে যাও। এর শাস্তি হবে।'

চাষীটা একটুও ঘাবড়াল না। হাত জোড় করে বললে—'রাজামশাই, এ কথা যদি মিথ্যে হয় তাহলে আপনার ঘোষণা মত আপনার রাজ্যের অর্ধেকটা দিয়ে দিন, তারপর না হয় শাস্তি দেবেন।'

চড়াং করে রাজার মনে পড়ে গেল ঘোষণার কথা। পরক্ষণেই তাই অপ্রস্তুত হয়ে বলে উঠলেন—'না, না, তুমি ঠিক কথাই বলেছ। ইস্! আমি ভুলেই গিয়েছিলুম বটে!'

চাষী তখন হাত জোড় করে বিনয়ের অবতার সেজে বললে—'আমার কথা যদি তাহলে সত্যি হয়, তবে আমার সেই সোনা দয়া করে শোধ করে দিন এবার রাজামশাই।'

রাজা আর কী করবেন!

চাষীর কাছে কথায় হেরে গিয়ে বাধ্য হয়েই তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও সোনা দিয়ে দিলেন।*

* আর্মেনিয়ার রূপকথা।

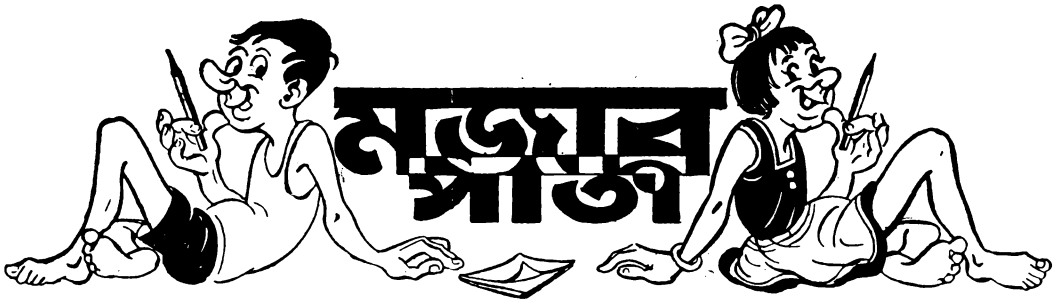


## নতুন ধাঁধা

১। এক দুই গণিতে
দুই তিন ভারতে
সবটা রান্নাতে।

—অজিত ও আরতি পাণ্ডে, জামসেদপুর।

২। না কাটলে বেশ তো চলে
হয় না চলার কষ্ট,
সবটা চলে জলের ঘাড়ে
বলছি তোমায় স্পষ্ট!

—শ্যামাপ্রসাদ দাস, কয়াপাট।

৩। খেতে বলেই মানা
খাদ্য তবু জানা।

—রুদ্রদেব ভট্টাচার্য, ভদ্রকালী।

## গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

১। দেহত্যাগ ২। চিতা ৩। সাহস

## গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ধাঁধার নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

**কলিকাতা**—জ্যোৎস্না, অণু, আলোদা, বৌদি ও বড়দা—কানাইধর লেন; অনিমা সরকার—পটলডাঙ্গা স্ট্রীট; আলোকরঞ্জন সরকার—পাটোয়ারবাগান লেন; হেমন্ত, সত্য ও প্রভঞ্জন সরকার—পাটোয়ারবাগান লেন; মদনমোহন ও ভারতী সরকার—কেশব সেন স্ট্রীট; পিন্টু, রীণা, বেণী ও রাজা—চুনাপুকুর লেন; রাণা, রিলি, মা ও বাপী—স্টেশন রোড; সৌমেন, নীলাঞ্জন, মৈত্রেয়ী ও সুজাতা—প্রিয়নাথ ঘোষ স্ট্রীট; পার্থ, পৃথা, সিদ্ধার্থ, সমীরণ প্রভৃতি—গরচা কার্স্ট লেন; সোনালী ও তাতু রায়—কবীর রোড; সন্দীপ, সুমিতা, অমল ও সুবোধ রায়—জামির লেন; চোটন, সোনামণি, শংখ মা ও বাবা—গোবরা রোড; রাজা, শুভা, বাচ্চু ও বুবাই—চারু অ্যাভিন্যু; পিনাকি মুখার্জী—পণ্ডিতিয়া প্লেস; জয়ন্তী, অতীশ, সুজয়, বাবা, পিকু প্রভৃতি—এন. কে. ঘোষাল রোড; ভবতোষ দত্ত—মাণিকতলা মেন রোড; অলক, অঞ্জনা, অমল, নন্দিনী, জয়ন্তী, সুদীপ প্রভৃতি—রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট; মিলন, দেবযানী, ইন্দ্রাণী ও সঞ্জয় গুপ্ত—অক্ষয় মুখার্জী রোড; মিঠু, মণিমালা, দেবাশীষ, রাণা ও লিপি—সত্য ডাক্তার রোড।

**২৪ পরগনা**—সোনাই, রূপাই ও টুবাই ভট্টাচার্য—ভাটপাড়া; শতাব্দী, মহার্ঘ, মাণিক, রঘুবীর, ভরত ও প্রদীপ—পানিহাটী; অমিত্ত, সুমিত্ত, বরুণা ও তথাগত ভট্টাচার্য—ভাটপাড়া; মিঠু, মিনু ঢলি, খোকন ও জলি—বেলঘরিয়া; দেবব্রত, উৎপল, গঙ্গা, ঝর্ণা ও মিতালী মণ্ডল—চালুয়াড়ী; মণিকা, রীণা, কেয়া ও জয়ন্ত ভট্টাচার্য—ভাটপাড়া; শান্তিময় হাজারী ও অসিতবরণ পাল—আমতলা; শ্রাবণী, সুমা, ঝুমা, মিতু, রাজু ও সঞ্জয়—বারাকপুর; শাহজাহানউদ্দিন আমেদ—রাজারহাট; ভাইয়া, পিন্টু, ভাইটি, রিন্টু ও ত্রিলোচন ভট্টাচার্য—ভাটপাড়া; সুবীর, সন্দীপ, ও সুমিত্ত ভট্টাচার্য—ভাটপাড়া; কাকলি, সঞ্জয়, কল্লোল ও পল্লব—ভাটপাড়া; রঙ্কি, কোলা ও টুটুল—কোন্নগর; আলীর, কাজল, ঝিমলি ও মা—বারাকপুর; তাপসী ভট্টাচার্য—নৈহাটী।

**হাওড়া**—ইন্দ্রনীল, নভোনীল, বাবা, মা ও পুপু—শিবপুর রোড; তনু, দোলা, কাকলী, বাবুয়া ও রাজা—কৃষ্ণধন কর লেন; সন্দীপ ও মিতালী ভট্টাচার্য—শালিমার; টুকু, পিকু ও লালি—সাঁতরাগাছি; সুব্রত, জয়ন্ত, বনশ্রী, জয়শ্রী ও মুরারি—ভট্টাচার্যপাড়া লেন।

**হুগলী**—শেলী, প্রবীর ও সুবীর গুহরায়—চুঁচুড়া; কৃষ্ণা, কাবেরী, জনা, মিলি ও বুড়ি—চুঁচুড়া; তাপস, আশীষ, লাকি, টুটন শিখা, বাবা ও মা—ভদ্রকালী; বিশ্বনাথ মুখার্জী—চুঁচুড়া; শুভ্রা দাস—চন্দননগর; নাণ্ড, রীণা, রীজা ও দাদু—কাঁঠালগড়িয়া; সমীর, ছন্দা, সঞ্চিতা ও সীমা বসু—বৈদ্যবাটী; চন্দ্রালী, সুতনু ও শান্তনুকুমার চক্রবর্তী—চন্দননগর; দিলীপ মালাকার—চুঁচুড়া; রবীন, ভোতা, চন্দ্রনাথ, মা, দাদু ও বড়মা—নারায়ণপুর; কুমু, ঝুমু, বাবু, তুলু, পালু প্রভৃতি—শ্রীরামপুর; অরূপ, অনুপ, অলক, শর্মিলা ও হরি—চুঁচুড়া; টুলটুল, বুলবুল ও শ্যামল—জানাই; মীনা, সন্ধ্যা, অনুরাধা, দীপান্বিতা, রাজেশ প্রভৃতি—শ্রীরামপুর।

**বর্ধমান**—শর্মিলাদি, মালা, বনি, মৌ, ফুচু প্রভৃতি—বানপুর; দেবু, শেতা, মা, বাবা, রূপালী প্রভৃতি—বার্নপুর; সলিল, সিদ্ধার্থ,

বাপ্টু, সৌরভ ও মনোজ সিংহ—রাণীগঞ্জ ; রূপালী, চৈতালী, মলয়, সোনালী ও মিতালী—সিঙ্গি ; প্রণব, কবিতা, স্বগতা, বাবা, মা ও দিদা—হিন্দুস্থান কেবল্‌স্‌ ; সমীর রায় ও পীযূষকান্তি চক্রবর্ত্তী—দুর্গাপুর-৪ ; খোকা, বুড়ো, জলি, ডলি, নেউল ও গীতা—শোভাপুর অ্যাভিন্যু ; পরিতোষ, মা, বাবা, যামিনী, সুতপা প্রভৃতি—দুর্গাপুর ; মাধবী, ভবানী, কৃষ্ণা ও মঞ্জরী—বার্নপুর ; দাদা, অসিতদা, ছোটদা, স্বরাজদা ও আমি—বার্নপুর ; বাবা, তৃপ্তি, কুমকুম, রীণা ও সীমা—বার্নপুর ; পামেলা, টুপাই, সীমা ও ভুতুন—বার্নপুর ; প্রদীপ, অপু, রণজিত, বীথিকা, কণিকা প্রভৃতি—বোলকুণ্ডা ; রায়দা, নাগদা, বিশুদা, রামশংকর ও বুবু—রাণীগঞ্জ ; কল্যাণ, জীতেন, উত্তম, সোমনাথ, বাপ্পা ও রীণা—রাণীগঞ্জ ; নিরুপমা, শিবানী, অন্নপূর্ণা, উত্তম প্রভৃতি—বাহাদুরপুর ; ঝর্ণা, রীতা ও বাপী চৌধুরী—দুর্গাপুর ; ছবি, কালু, লুলু ও ভুলু সেন—চিত্তরঞ্জন ; গৌতম, মুন, বামী প্রভৃতি—দুর্গাপুর ; অমিয়, বিজয়লক্ষ্মী, সুমিত ও শ্বেতা ব্যানার্জী—চিত্তরঞ্জন ; বাণী, টাপু, তনুশ্রী ও অনুশ্রী ঘোষ—বার্নপুর ; মুনমুন, টুলু, লিলি, বাপকু, নেলু প্রভৃতি—দুর্গাপুর ; মা, মিতা, সুজাতা ও বুম্বা—ছোটদিথারী—বার্নপুর ; নন্দজী, পণ্ডিত, বিকাশ, প্রণব ও পচু—বর্ধমান ; তন্ময়, শর্মিলা, নীলাঞ্জনা, অলক ও মাস্টারমশাই—দুর্গাপুর ; সোনা, মণি ও ভোলানাথ কর—কুসুন্তোড়িয়া ; প্রকাশ ও চন্দ্রশেখর—বার্নপুর ; বাপি, বাচ্চু, বাবলু, বাবলি ও গৌতম—বার্নপুর ; সোমনাথ, সরোজ, বানী ও অন্নপূর্ণা ঘোষ—বার্নপুর ; বাবা, সেজমামা, উত্তম ও গৌতম ভাণ্ডারী—কামারপাড়া ; শিলা, রীতা, শর্মিষ্ঠা, শিল্পী, অরূপ ও ভাবলা—মনবেড়িয়া ; শীলা, নীলা, রাজু, দীপু ও বৈদ্যনাথ—মনবেড়িয়া ; সাধন, লাবু, তাপু, বড়ু ও সঞ্জয়—শীতলপুর কলিয়ারী ; রীণা, বৃত্তি ও ডি. পি. সেন্টারের কর্মীবৃন্দ—বার্নপুর ; সমীর, প্রবীর, প্রদীপ, বাবা ও মা—বল্লভপুর ; শুভাশীষ, গোপালী, দুলাল, দুলালী প্রভৃতি—বড়বেলুন।

**মেদিনীপুর**—মা, দেবু, তুলসী ও অজু—পাটনাবাজার ; সাহেব, গোপলু, খেলনা, সোনু, খুকু, বাবা প্রভৃতি—মহিষাদল ; চন্দন, অর্চনা ও সুজিত দত্ত—রবীন্দ্রনগর ; সুব্রত ও সৌমিত্র বোস—খড়্গপুর ; জ্যোতিকণা ও নারায়ণ মুখোপাধ্যায়—খড়্গপুর ; গোপু, রুমা, সোমা, চন্দন, রুদ্র, জগন ও বাবা—মহিষাদল ; রাজা, সাথী, মুন্না, স্বপন, দ্বিজদাস ও মিহির—মাওকাতপুর।

**নদীয়া**—আবীর, অভিজিৎ, সোনালী ও পুতুল—লালপুর।

**মুর্শিদাবাদ**—সন্ত, পিন্টু, শিবু, মাণিক, বাপি প্রভৃতি—ফরাক্কা।

**বাঁকুড়া**—স্বপন, স্বপ্না ও সুশান্ত প্রভৃতি—রাউতোড়া ; সুশান্ত, ঝর্ণা ও খুকু—রাউতোড়া ; সত্যনারায়ণ গাঙ্গুলী ও অমিয় নায়ক—রাউতোড়া ; পরিমল, শ্যামল, শীতল ও সরল গঙ্গোপাধ্যায়—মটুকবনী ; সীমন্ত, হেমন্ত, অনাথবন্ধু ও নিখিলমণ্ডল চট্টোপাধ্যায়—মটুকবনী ; শুভ্রাংশু, সুধাংশু, হিমাংশু, সিতাংশু প্রভৃতি—মটুকবনী ; সমীর, সঞ্জয় ও সুমনা সামন্ত—রেলকলোনী ; ত্রিলোচন, নিবাস ও মুক্তি গাঙ্গুলী—রাউতোড়া ; সতীশ, শুভাশীষ ও আশীষ গাঙ্গুলী—রাউতোড়া ; দিলীপ, সীমা, স্বপন, উমা ও শ্যাম—ঝাঁটিপাহাড়ী ; মৃণাল, অনিতা, অমিতা, সোমা ও নিবেদিতা—সলদা ; আরতি, কৃষ্ণা, সুবল, বেণু প্রভৃতি—ভিলুড়ী ; টিমপু, বাচ্চি, পম্পি, ঝুমা ও দেবাশীষ—মালপাড়া ; মা, রুমা, দীপ ও মাস্টারমশাই—মালপাড়া ; মানসী, ছোড়দা, চানু, বুনি ও মাধবী—মালপাড়া ; চায়না, চন্দনা, নূপুর, মিঠু ও বুলু—ভিলুড়ি ; নিরঞ্জন, নিমাই, প্রবীর ও ঋতুপর্ণ—প্রতাপবাগান ; দাদা, বৌদি, কল্যাণ, শুক্লা ও দেবব্রত বটব্যাল—ভক্তাবাঁধ ; শম্ভুনাথ সিংহ—ভক্তাবাঁধ ; নন্দলাল মুসিব—ঝাঁটিপাহাড়ী।

**বীরভূম**—টিকু, গোরা, নিতাই, প্রভা ইত্যাদি—মুরারই ; নীরব, মমতা, সাবন্তা ও গোপাল—মুরারই বাজার ; ছোটকাকু, দিপু, বেবী, প্রদীপ প্রভৃতি—দুবরাজপুর ; বাপি, মনি, টুটুল ও সচ্চিদানন্দ রায়—সিউড়ি ; প্রবোধকুমার দত্ত—মুরারই ; সেন্টু, বাসন্তী, চৈতালী ও শ্রাবণী—মুরারই ; দীপক, নিতাই, শুভ্র, নিটুল, সামসুদ্দিন প্রভৃতি—মুরারই ; সৌমিত্র, শিখা, অনুরাধা ও আশীষ ভৌমিক—দুবরাজপুর।

**পুরুলিয়া**—মহাদেব, আরতি, দীপালি, অসিত ও শ্যাম মাহাতো—হাতিরাম গোড়া ; শ্রীরাজ, পার্থপ্রতিম, ধীরাজ, মহারাজ ও স্বরাজ চৌধুরী—মধুপুর ; পুণ্ডরীকাক্ষ হাজরা ও স্বপনকুমার হুজুরী—ছড়রা ; মিনু, হিমু, পাপা ও ছবি—পুরুলিয়া ; অংশুমান, দীপ্তিমান ও পার্থপ্রতিম মাজী—ঝাপড়া ; দাদু, অপর্ণা ও সুপর্ণা মাজী—ঝাপড়া ; মা, বাবা, অবনী ও স্বপন মাজী—ঝাপড়া ; শীতলপ্রসাদ বটব্যাল—অলঙ্গিডাঙ্গা ; অনিল, সুধীর, বিশ্বনাথ, লম্বোদর, বাসন্তি প্রভৃতি—হেটগুণ্ডই ; অনু, মিতু, ববি ও তোষল—সান্তালদি ; গৌতম ব্যানার্জী ও মালা ঠাকুর—গাড়িধানা।

**পশ্চিমদিনাজপুর**—ঝর্ণা, সুভাষ, সুদীপ ও অর্চনা চট্টোপাধ্যায়—রায়গঞ্জ।

**কুচবিহার**—রিন্টু, দীপু, মুনা, বুলি ও তুলতুলি—বিশ্ব সিংহ রোড।

**দার্জিলিং**—সুজাতা ঠাকুর ও কৌশিক ভট্টাচার্য—শিলিগুড়ি ; সুশান্ত, সুমন্ত, সুকান্ত প্রভৃতি—শিলিগুড়ি ; তাপস, মৈত্রেয়ী ও নিখিল দত্ত—সোনাপুর।

**বিহার**—তনুশ্রী, রুবেন ও বনশ্রী করগুপ্ত—জামসেদপুর-৫ ; মঞ্জু, অঞ্জু ও ইতি চট্টোরাজ—জামসেদপুর-৩ ; শ্রীজয়, সুময়, সোনালী, কাকলি প্রভৃতি—পাটনা-১ ; মিলি ও পলি—জামসেদপুর ; মলি, ছবি, জনা, অঞ্জন ও নিতাইদা—টেলকো ; আশিষ, সমীর, বুটু, ছক্কু, স্বপন প্রভৃতি—খগোল ; অপর্ণা, জয়ন্ত, স্বপন ও বাপী—কদমা ; বাবুয়া, মণি, তুলু, রাজা, শঙ্কু ও পিঙ্কু—জামতাড়া ; বাবলা ও ফাস্ট্‌স বরাট—ধানবাদ ; পরেশ, সুখময় জীমূতবাহন ও প্রণতি বক্সী—বাসদেওপুর ; স্বপন, মিন্টু ও তপন—ধানবাদ ; অসিত, রণজিৎ, রীতা, মা, বাবা ও দিদা—কুমারডুবি ; মা, অমিত বেলা, লালী, মনো ও লাল্টু আড্যি—ধানবাদ ; দিদা, জামাইবাবু, সন্টু মণি ও বিন্টু মণি দত্ত—সাহারসা ; নিশীথ, অসিত, তড়িৎ, অমিত, বাবা ও মা—ঘাটশীলা ; বাবা, মা, দিদা, দাদা, দিদি ও দেবাশীষ মিত্র—কদমা ; সনৎদা, শৈলেন্দ্র, কাঞ্চন ও শিপ্রা রায়—চাঁচ-পটারী ; মনুয়া, চিত্রা, পুতুল, তুতুল, বুবুল ও টুবুল—চিরকুণ্ডা ; রেবা, লীনা ও মিনা দাস—জামসেদপুর ; রীণা, মনা, বাবলি, মীনা, শচীন্দ্র প্রভৃতি—জামসেদপুর ; দীপক, গৌতম, বাপি, সুচিত্রা, বাচ্চু প্রভৃতি—জামসেদপুর ; সরোজ, মালা, ইলা, রবি, জ্যেঠু, জ্যেঠিমা, বাবা ও মা—গোলমুরি ; শর্বরী, সর্বাণী, বিনিতা, সুনিতা ও অর্ণব পাণ্ডে—সাকচী ; দেবাশীষ, সুজাতা, দেবকল্যাণ, শুক্লা ও অনুপ বটব্যাল—কাপাসারা।

**আসাম**—স্বপন, উজ্জ্বল, উৎপল, সজল, সোমা প্রভৃতি—লিডু ; মা, বাবা, স্মৃতি, হারীত, হরকিশোর প্রভৃতি—ডিব্রুগড় ; মা, বাবা, কাজল, কানুদা প্রভৃতি—মালিগাঁও ; শিলা, শোভা, পাপু, বড় ও বাবলু ব্যানার্জী—গৌহাটী-১২।

**মধ্যপ্রদেশ**—গোপাল, খোকন, রীণা ও খোকা—বিলাসপুর।

**উত্তরপ্রদেশ**—খুকু, লিলি, কলি, বুলা ও বিশু—বারাণসী।

**নিউদিল্লী**—পারমিতা ঘোষ—নিউদিল্লী-১৬।

# আজব দোকান

শৈলেশ ভড়

দোকানের নাম 'কিউরিও শপ্'।

বাইরে থেকে বোঝা যায় না কিছুই, কিন্তু দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেই চোখ ধাঁধিয়ে যায়। সাদা আর রঙিন আলোর বন্যায় থৈ থৈ করছে সমস্ত ঘরটি।

শো-কেসগুলিতে থরে থরে সাজানো অদ্ভুত সব জিনিস। থালা, বাসন, খেলনা, পুতুল, ফুলদানি, বাতিদান, ঝাড়লণ্ঠন আর জন্তু-জানোয়ারের যেন নিঃশব্দ হট্টগোল।

ঘরের মাথায় রঙিন কাগজের শিকল ঝুলছে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবধি। তার ফাঁকে ফাঁকে রূপোলী জরির ফিতে ঝুলছে লম্বা হয়ে।

সব মিলিয়ে সুন্দর সাজানো দোকান।

দোকানটি মিস্ উইলটনের। বয়স অল্প হলেও বেশ চটপটে। সারাদিন কলেজে পড়াশোনা করে আর বিকেলে দোকান খুলে বসে। একাই বিক্রি করে আর দাম নেয়।

দোকানের একটু দূরেই গলির মধ্যে পিটার উডের বাড়ি। তিনি আদালতে ওকালতি করেন। কিন্তু এখনো পেশায় ঠিকমত জমিয়ে বসতে পারেননি। তবে আশা আছে একদিন বড় হবেনই।

সেদিন সন্ধ্যায় তিনি ফিরছিলেন এই দোকানের পাশ দিয়ে। হঠাৎ মনে হল পরশু তাঁর এক বন্ধুর বিয়ে এবং একটা কিছু উপহার দেওয়া দরকার।

কথাটা মনে হতেই দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লেন দোকানের মধ্যে।

সত্যি মুগ্ধ হবার মত। শুধু দোকানের চেহারা নয়, মালিকের চেহারাও।

'আসুন আসুন'—স্বাগত জানালেন উইলটন।

হাসিমুখে কাছে এসে পিটার উড তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যটা জানালেন।

উইলটন একটা শো-কেস থেকে একটা ফুলদানি নিয়ে এসে বললেন, 'এটা দিলে কেমন হয়? ভারতবর্ষের জয়পুরের জিনিস। কী সুন্দর সূক্ষ্ম কাজ দেখেছেন?'

হাতে নিয়ে দেখলেন পিটার উড।

'বাঃ, ভারি সুন্দর। এইটাই দিন।'

দোকানে ভিড় ছিল না। তাই আলাপও জমে উঠল। জিনিসটা কাগজে মুড়ে প্যাক করতে করতে উইলটন বললেন, 'আপনি কাছেই থাকেন অথচ একদিনও এখানে পদার্পণ করেননি। জানেন, আমার বাবা এই দোকানটি করেন। প্রথমে তেমন চলত না। তারপর একটা দুষ্প্রাপ্য জিনিস ভারতবর্ষের এক রাজাকে বিক্রি করে প্রচুর লাভ করেন। আর সেই থেকে আমাদের ভাগ্য খুলে যায়। হাজার হাজার বছরের পুরানো ভাস্কর্য শিল্প বিক্রি করা বাবার এক অদ্ভুত নেশা ছিল।'

'আমার অবশ্য ওসবে কোন নেশা নেই।' বললেন পিটার উড। তবে আলাপ যখন হল তখন মাঝে মাঝে আসব নিশ্চয়ই।

ফুলদানিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন পিটার উড।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে একদিন সন্ধ্যায় লণ্ডন শহরে হঠাৎ শুরু হল তুষারপাত। আর সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া আর জোলো ঠাণ্ডা। বাইরে বেরোনো তো দূরের কথা, ঘরের মানুষদের হাড়কাঁপুনি লেগে যাবার যোগাড়।

আদালত থেকে ফেরার পথে ভারী মুশকিলে পড়লেন পিটার উড।

হাওয়ায় এক পা এগোয় কার সাধ্য, আর তুষারের গুঁড়োগুলো কাঁটার মত বিঁধছে চোখে মুখে। পরনের প্যান্ট-কোট ভিজে সপসপে হয়ে যাচ্ছে।

এভাবে বাড়ি অবধি পৌঁছনো যাবে না কিছুতেই।

পাশেই সেই কিউরিও শপ। অতএব···

কিন্তু ঢুকতে গিয়ে থেমে গেলেন পিটার উড।

'দোকান বন্ধ' নোটিশ ঝুলছে দরজার হাতলে। আর হাতল থেকে হাতটা সরিয়ে নেবার আগেই একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল।

হাতলটা ঘুলছে আস্তে আস্তে। বোধহয় আপনা থেকেই অথবা ভিতর থেকে কেউ ঘোরাচ্ছে।

ক্লীক্? এবার দরজাটা খুলছে। একটু একটু করে সবটা খুলে গেল।

ঘরের মধ্যে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

ব্যাপার কী?

না, এই অন্ধকারের মধ্যে তিনি ঢুকবেন না। কিছুতেই ঢুকবেন না। চলে যাবেন। কিন্তু আশ্চর্য, তিনি একটুও নড়তে পারলেন না। তাঁর মনে হল ভিতরের অন্ধকার তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে—এসো, এসো, এসো।

এদিকে বাইরে ঝড় জলে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। অবশেষে পিটার ঢুকে পড়লেন সেই দোকানের কালো জমাট অন্ধকারের মধ্যে। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল, বাইরের অপেক্ষা ঘরের মধ্যে যেন আরো বেশী ঠাণ্ডা।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসবার জন্য ঘাড় ফেরাতেই দেখলেন খোলা দরজাটা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

ক্লীক্। শব্দ করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে রক্তের একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল পিটারের। অজানা আতঙ্কে বুকটা একটু থরথরিয়ে উঠলো যেন।

তাঁর মনে হল ভেতরে আসা ঠিক হয়নি।

বেশ তো, দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেলেই ত হয়। কে আটকে রেখেছে তাঁকে?

ইচ্ছে হচ্ছে খুবই। কিন্তু পারছেন কই? পা দুটো কে যেন মাটির সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে

'মিস্ উইলটন, আপনি কোথায়? আমি পিটার উড।'

এই কি পিটার উডের গলা?

আদালতে সওয়াল করার সময় যে গলায় বাজ ডাকত সে গলায় এখন বিড়াল ডাকছে।

কোন সাড়া নেই। প্রতিধ্বনি ফিরে এল পিটারের নিজের কাছেই।

আর ঠিক সেই সময় তার কানের পাশে কে যেন বলে উঠল, 'একটু অপেক্ষা করুন আমি এখনি আসছি।'

না, এ কণ্ঠস্বর উইলটনের ত নয়ই, কোন মানুষেরই নয়। নিশ্চয়ই কোন অশরীরীর।

পিটার ভেবে পাচ্ছেন না, তিনি কী করবেন। আর করবার কীই বা আছে। কোন এক প্রচণ্ড শক্তির আকর্ষণে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

বাদুড়ের মত কালো কালো কুৎসিত অন্ধকার ঝুলছে ঘরের মধ্যে। দরজার কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাইরেও সেই নীরন্ধ্র অন্ধকার। ঝড় জলে সমস্ত লণ্ডন শহরটাই বোধ হয় নিষ্প্রদীপ হয়ে গেছে।

এবার ক্ষীণ একটা আলোর রেখা দেখা গেল।

বাতি জ্বালিয়ে কে যেন আসছে কাউণ্টারের ভিতর থেকে। আর সেই ক্ষীণ আলোয় দোকানটা আরো রহস্যময় হয়ে উঠল।

আলো হাতে লোকটা সামনে এসে দাঁড়াতে রীতিমত চমকে উঠলেন পিটার।

মুখে স্পষ্ট বলিরেখা। সর্বাঙ্গে লোলচর্ম। বার্ধক্যে কুব্জ তার পিঠ। হাতের প্রদীপের আলোর মত চোখ দুটি স্তিমিত। মড়ার মত নিষ্প্রভ। যেমন রুগ্ন তেমনি ক্লান্ত।

'কী নেবেন?' মাকড়সার জালের মত সূক্ষ্ম কণ্ঠস্বর।

লোকটা সামনে এসে দাঁড়াতে চমকে উঠলেন পিটার।

'এসেছি যখন তখন কিছু একটা নিতেই হয়'—কোনরকমে বলতে পারলেন পিটার, 'দিন যা হয়।'

বাতিটা শো-কেসের ওপর তুলে ধরে লোকটি বললে, 'এইটে নিন।'

'কী ওটা?'

'চুনা পাথরের তৈরী একটা ব্যাঙ।'

'ব্যাঙ?' পিটারের মনে হল তার মুখটাও যেন ঐ ব্যাঙের মত হয়ে গেল।

'হ্যাঁ, এটা নিয়ে যান।'

'কত দাম?'

'আট পেনি।'

'কি বললেন,' নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না পিটার।

লোকটি এবার হাসল। না, হাসি ঠিক বলা যায় না। ঠোঁটটা ফাঁক করল একটু।

ভয়ে রক্ত জল হয়ে গেল পিটারের। এমন বিশ্রী হাসি তিনি জীবনে কারোর দেখেননি। অন্ততঃ কোন জীবিত মানুষ এমনভাবে হাসতে পারে বলে মনে হয় না।

'আট পেনি।' লোকটি আরো স্পষ্ট করে বলল।

পকেট থেকে পয়সা বার করে তিনি লোকটির হাতে দিলেন। হাত ত নয় যেন বরফের কাঠি।

জিনিসটা পকেটে নিয়ে পিটার দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন।

বাইরে এখনো সমানে ঝড় আর তুষারপাত হচ্ছে। আর তেমনি হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা। তবু রক্ষে, ঐ ভয়াবহ লোকটার সঙ্গ ত্যাগ করা গেছে।

না, যায়নি।

পিটারের মনে হল লোকটার দৃষ্টি এখনো তাঁকে অনুসরণ করছে। কথাটা মনে হতেই তিনি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, দরজার কাঁচের ওপর দুটো মরা চোখ রেখে লোকটা একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে।

পিটার তাড়াতাড়ি গলির ভিতর ঢুকে পড়লেন।

সম্প্রতি পিটারের সময়টা খুব খারাপ যাচ্ছে। টাকা পয়সার খুবই টানাটানি। কী যে করবে ভেবে কূল পাচ্ছেন না কিছু।

সেদিন সকালে হঠাৎ ওঁর এক বন্ধু এসে হাজির।

চা খেতে খেতে পিটারের আলমারির মধ্যে ব্যাঙের মূর্তিটা দেখে সে রীতিমত চমকে উঠল। কি একটা নামী পুরনো শিল্প সামগ্রীর বেচা-কেনার ব্যবসায়ে সে বেশ ফেঁপে উঠেছে।

মূর্তিটা দেখে বন্ধু বললে, 'আমার যদি ভুল না হয় তাহলে বলতে হবে ওটা বিখ্যাত সিয়া আমলের ভাস্কর্য এবং ওর দাম এখন দু' হাজার পাউণ্ড।'

'ফুঃ' তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন পিটার। 'আমার কাছে দাম নিয়েছে আট পেনি। তা ভাই, তুমি ওটা নিয়ে গিয়ে আমাকে দু' হাজার পাউণ্ড পাঠিয়ে দিও।'

আশ্চর্য। এক সপ্তাহের মধ্যে পিটার তাঁর বন্ধুর কাছ থেকে সত্যিই দু'হাজার পাউণ্ডের একটা ড্রাফ্‌ট্ পেলেন। আর পিটারের মনে হল, এই সব টাকা তাঁর একলার নয়। কিছু উইলটনের প্রাপ্য।

মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দোকানে এসে হাজির।

'আসুন আসুন' উইলটন তাঁকে সাদর আহ্বান জানালেন, 'বলুন আপনার জন্যে আমি কী করতে পারি।'

পিটার সে রাত্রের সমস্ত ঘটনা তাঁর কাছে খুলে বললেন।

অবাক্ চোখে উইলটন সব শুনলেন। তারপর বললেন, কলেজের ফাইনাল পরীক্ষার জন্য তিনি পনেরো দিন দোকান বন্ধ রেখেছিলেন। তিনি ও জিনিস বিক্রি করতেই পারেন না। পিটার নিশ্চয়ই ভুল করেছেন।

'না আমি ভুল করিনি।' জোর গলায় বললেন পিটার, 'এই দোকান থেকে আমি কিনেছি। যিনি বেচেছেন তাঁকে অস্পষ্ট দেখেছি।'

'ছবি দেখলে চিনতে পারবেন?'

'পারবো।'

উইলটন ড্রয়ার থেকে একটি অ্যালবাম বার করে পিটারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এর মধ্যে আমাদের আত্মীয়ের ছবি আছে। বার করুন তো, কে আপনাকে দরজা খুলে দিয়ে জিনিস বেচেছে?'

পাতা ওলটাতে ওলটাতে এক সময় থেমে গিয়ে বললেন পিটার, 'এই সেই লোক। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, এই সেই লোক।'

ছবিটার দিকে চেয়ে উইলটনের চোখের পাতা ক্রমশঃ ভারী হয়ে এল। দু' এক ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে।'

'কে ইনি।'

'আমার বাবা!' ভেজা গলায় বললেন উইলটন, 'আজ দশ বছর আগে তিনি মারা গেছেন। এই কিউরিও শপ তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন।

ঠিক এমনি সময় বাইরে থেকে একটা ঝোড়ো হাওয়া ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দরজাটা কখন খুলে গেছে ওরা জানতেই পারেনি। এবার দেখা গেল দরজাটা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ক্লীক!

---

বাজারের সেরা অভিধান—

সুবলচন্দ্র মিত্র প্রণীত

**Century Dictionary** (ENG.-BENG.) Price Rs. 20·00

**Century Dictionary** (BENG.-ENG.) Price Rs. 20·00

ডাকমাসুল সহ টা. ২৪·০০ স্থলে মাত্র টা. ২০·০০ অগ্রিম পাঠালে রেজেস্ট্রি ডাকে পাঠান হচ্ছে

**Pocket Dictionary** (ENG.-BENG.)
**Pocket Dictionary** (BENG.-ENG.)
} শীঘ্রই নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে

**NEW BENGAL PRESS (Private) Ltd.**, 68, College Street, Calcutta-12

# 'উজ্জ্বল' শুভ্রতার জন্যে

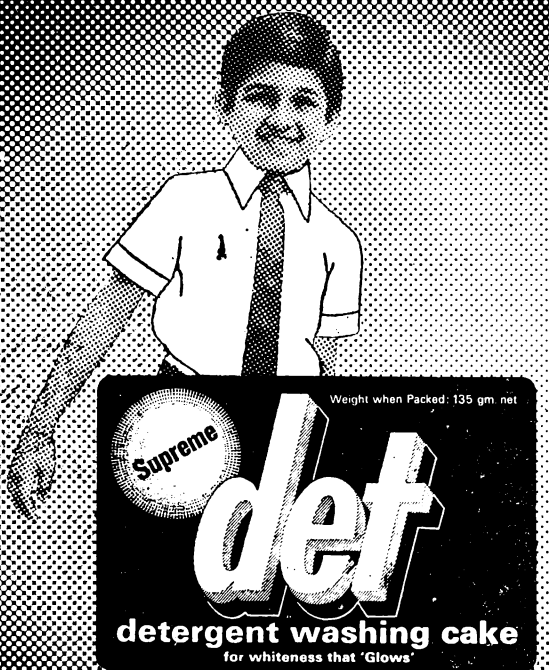


## সুপ্রীম ডেট ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার কেক

নতুন উন্নততর ডেট কেক বাজারের সেরা ডিটারজেন্ট কেক। এতো পরিষ্কার করার ক্ষমতা, এতো ফেনা ও সুগন্ধকে হার মানায়,কাপড় ধোয়ার এমন কোন কেক আর নেই। ব্যবহার করে দেখুন। তফাৎ বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, 'উজ্জ্বল' শুভ্রতার জন্যে সুপ্রীম কেক।

**ধবধবে সাদা, ডেটের সাদা**

Shilpi-DM 7/76 Ben

# ছোটোরা যখন ছোটো থাকে...

তখন তো তাদের দুরন্ত হওয়াই স্বাভাবিক। আর যারা স্বভাবতই শান্ত তারাও তো কখনো সখনো দুরন্তপনা করে। খেলতে গিয়ে অন্য সবায়ের মতো তারাও হাত-পা কেটে ফেলে। শরীরের নানা জায়গা তাদেরও ছড়ে যায়। ঘষা লাগে।

এইসব কাটা-ছেঁড়া-ফাটা-ঘষালাগা জায়গাগুলো দুষিত হ'য়ে উঠতে কী খুব সময় লাগবে! কারণ ধুলো-বালির নোংরা ধুলেও সহজে যায় না। তাই **বোরোলীন** হাতের কাছে রাখতে পরামর্শ দেওয়া।

# বোরোলীন

ব্যবহারের অভ্যাস ছেলেবেলা থেকেই গ'ড়ে তোলা ভালো। দুরন্তপনার দিনগুলো থেকেই জানতে হবে, ছোটোবেলার দুষ্টুমির চিহ্নগুলো যাতে দুষিত না হ'য়ে ওঠে, যাতে ত্বক সুস্থ, সবল, স্বাভাবিক ও মালিন্যমুক্ত থাকে তারজন্য সুরভিত

অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম **বোরোলীন**

ব্যবহার করাই নিরাপদ।

**জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড**

বোরোলীন হাউস, ১ শিরীশ এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০ ০০৩

ছোট ছোট বাসন কোসন
চামচ হাঁড়ি-কুড়ি
'ডাটার' গুঁড়ো মশলা দিয়ে
রান্না ভালই করি।

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ

# * ছোটদের কাছে অতি লোভনীয় একটি সিরিজ *

## বিশ্ববিখ্যাত বিদেশী বইগুলির সহজ সরল অনুবাদ

● চালস কিংসলি ● আর. এম. ব্যালেণ্টাইন ● জর্জ ইলিয়ট ● জুলে ভার্নে ● এড্‌গার ওয়ালেস
● আলেকজাণ্ডার ডুমা ● মার্ক টোয়েন ● ম্যাক্সিম গোর্কী ● নিউ ওয়ালেস ● চার্লস ডিকেন্স
● এইচ জি ওয়েলস প্রমুখ খ্যাতনামা লেখকদের বইয়ের অনুবাদ। প্রতি কপি ৩·০০

ম্যান ইন দি আয়রণ মাস্ক
ওয়ার অব দ্য ওয়ালড
ক্যাটি্ওনা
পাডনহেড উইলসন
রাউণ্ড দি ওয়ালড ইন এইট্টি ডেজ
কর্শিকান ব্রাদার্স
ষটল ইম্প, ডন কুইক্সোট
দি লাস্ট অব দি মহিক্যান্স
কাউণ্ট অব মন্টিক্রিস্টো
টম ব্রাউনস্ স্কুল ডেজ
আঙ্কল টমস কেবিন
স্যামসন ও ডালিলা
বেন হুর, মাদার
ফার্স্ট মেন ইন দ্য মুন
লাস্ট ডেজ অব পম্পেই
কিডন্যাপড
আইভ্যানহো
টয়লার্স অব দি সি
অলিভার টুইস্ট
ট্রেজার আইল্যাণ্ড
থ্রী মাস্কেটিয়ার্স
হাঞ্চব্যাক অব নোৎরদাম
জেন আয়ার
এ টেল অব টু সিটিজ
মাইকেল স্ট্রগফ
ডাঃ জেকিল এণ্ড মিঃ হাইড
দ্য ম্যান হু লাফস
অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট
ইনভিজিবল ম্যান
ট্র্যাজেডি অব সেক্সপিয়ার
মিস্ট্রি অব প্যারি
ব্ল্যাক অ্যারো
দ্য লস্ট কিং
ডেভিড কপারফিল্ড
লা মিজারেবল
কুয়োভাদিস
ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন
লাইটহাউস
এ কানেক্টিকাট ইয়াংকি ইন কিং আর্থার্স্ কোর্ট
ওডিসি ও ইলিয়ড
ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট
অ্যাডভেঞ্চার অব মার্কোপোলো
রব রয়
টোয়েন্টি ইয়ার্স আফটার
নিকোলাস নিকোলবি
কিং সলোমনস্ মাইনস্
সেক্সপিয়ারের কমেডি
ব্ল্যাক টিউলিপ
দি প্রিন্স এণ্ড দি পপার
গ্রেট এক্সপেক্টেশন
দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ড

**শীঘ্রই বাহির হইবে !**

● হাইপেশিয়া—চার্লস কিংসলি
● কোরাল আইল্যাণ্ড—আর. এম. ব্যালেণ্টাইন
● মিডল মার্চ—জর্জ ইলিয়ট

**শীঘ্রই বাহির হইবে !!**

● দ্য ফোর জাষ্ট মেন—এড্‌গার ওয়ালেস
● দ্য ফেয়ার গড—নিউ ওয়ালেস
● দ্য সন অব পোর্থোজ—আলেকজাণ্ডার ডুমা
● দ্য সান অলসো রাইজেস—এভারেস্ট হেমিংওয়ে

** এইরূপ অনেক বই পর পর বাহির হইবে

**দেব সাহিত্য কুটীর ঃ—২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯**

# জামা কাপড়ের আয়ু তো আপনারই হাতে

শুধু বাড়ীতে কাচাই যথেষ্ট নয়

এর জন্য সবচেয়ে আগে দরকার

উচ্চমানের ডিটারজেন্ট পাউডার

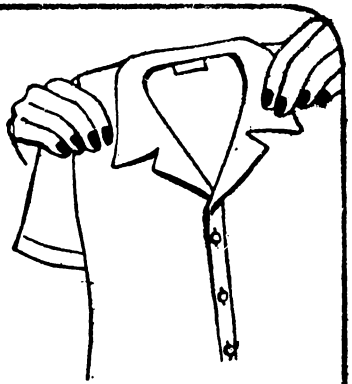

ডিটারজেন্ট পাউডার যদি জলে গরম হয় তবে জানবেন তা আখেরে জামাকাপড় অবশ্যই নষ্ট করবে। নতুন ফরমুলায় তৈরী সিফোম ডিটারজেন্ট পাউডার জলে গরম হয় না। তাই সিফোম জামাকাপড় অনেক বেশী টেকসই করে। তাছাড়া ডিটারজেন্টে ভরপুর নাম মাত্র সিফোম অল্প খরচে অল্প পরিশ্রমে অনেক বেশী জামাকাপড় অনেক বেশী পরিষ্কার ও ঝলমলে করে।

# সিফোম

কাপড় বাঁচায় পয়সাও বাঁচায়

র‍্যাপসল ল্যাবরেটরী

১৪৬/৫ লেক গার্ডেনস্ ● কলিকাতা-৪৫

RL-10


---


ছোট্ট বন্ধুরা শোন ...

"জাদুরে আমার আদুরে গোপাল
নাকটি নাদুস গোপনা গাল,
ঝিকিমিকি চোখ মিটিমিটি চায়,
ঠোঁট দুটি তায় টাটকা লাল।"

আমি রোজ পড়ি, তোমরাও পড়ে দেখো-
হাসির রাজা সুকুমার রায়ের

## খাগড়াই

পড়ে মজা পাবে— খুশি হবে
ছড়ার সাথে ছবিগুলো চলেছে সমান তালে-

দাম : আড়াই টাকা মাত্র

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড · কলিকাতা ৯

**❋সেরা Note বললে ●A. T. DEV● এর Note ই বুঝায়❋**

S. F. NOTES FOR 1978

S. F. NOTES FOR 1978

**A. T. D E V**

NOTES ON

পাঠ সংকলন ( প্রথম খণ্ড )

( গদ্যাংশ ও পদ্যাংশ )

( IX & X ) দাম—টা. ১০·০০

NOTES ON

Selections From

English Prose & Verse ( IX )

Price—Rs. 10·00

NOTES ON

সংস্কৃত-সাহিত্য-সংগ্রহ

( গদ্যাংশ ও পদ্যাংশ )

Class X দাম—টা. ৮·০০

NOTES ON

সংস্কৃত-সাহিত্য-সংগ্রহ

( গদ্যাংশ )

Class IX & X

দাম—টা. ৭·০০

NOTES ON

সংস্কৃত-সাহিত্য-সংগ্রহ

( পদ্যাংশ )

Class IX & X

দাম—টা. ৫·০০

NOTES ON (Pre-University)—

| | |
|---|---|
| English Prose | Rs. 2·50 |
| English Poetry | Rs. 3·50 |
| Bengali | Rs. 4·00 |

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড—২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

# শব্দবোধ অভিধান

বাঙ্গালো ভাষার অদ্বিতীয় অভিধান

একখানি অভিধানে চরিতাবলী, বিবিধ জ্ঞাতব্য,
ইয়ার বুক ও সাইক্লোপিডিয়ার প্রয়োজন মিটবে

এতে ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক বিবরণ, বাঙ্গালো বানানের
নিয়ম, বাঙ্গালো ধাতু প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ প্রায় দুই হাজার
পৃষ্ঠার উপর এই বই আপনার একটি সম্পদ।

মূল্য চল্লিশ টাকা

চল্লিশ টাকা পাঠালে রেজিস্টারি করে বই পাঠানো হবে··

দেব সাহিত্য কুটীর

২১, ঝামাপুকুর লেন · কলিকাতা ৯

Regd. No. W. B./E. C —60



# এবার পূজায়.....

দেব সাহিত্য কুটীর সম্পাদিত

আগমনীর পাতায় পাতায় থাকবে ছোটদের মনের মত নানাজাতের গল্প। যেমন ভূতের গল্প, হাসির গল্প, রূপকথার গল্প, রোমাঞ্চকর গল্প, হাসির নাটিকা ইত্যাদি। আর থাকবে নানা ধরনের কবিতা, অসংখ্য একরঙা ও তিনরঙা ছবি, রঙিন্ চিত্র-কাহিনী, কার্টুন ইত্যাদি ছোটদের ভাললাগার মত সব কিছু উপকরণ। প্রতি বছরের মত এ বছরও বাংলার খ্যাতনামা লেখকদের লেখাতে আগমনী সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

**দাম—দশ টাকা**

এবার পূজায়

শিবরাম চক্রবর্তীর

হাসির রাজা শিবরাম চক্রবর্তীর অসংখ্য হাসির গল্পের দুষ্প্রাপ্য সংকলন। যেমন সব গল্প, তেমনি থাকবে মজার মজার ছবি। একরঙা ও তিনরঙা ছবিতে বইটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। বইটি পড়তে পড়তে সত্যিই হাসির চোটে দম ফাটবে।

ছেলেমেয়েদের হাতে দেবার একটি সুন্দর বই।

**দাম—ছয় টাকা**

এবার পূজায়.....

মধুসূদন মজুমদার সম্পাদিত

বহু লেখকের বহুরকম গল্পে ভরা এই সানাই। সানাই-এর মিষ্টি সুরের মূর্ছনার মত বইটির মিষ্টি গল্পগুলিও ছেলেমেয়েদের মন ভরিয়ে তুলবে। শুধু কি গল্প, যেমনি গল্প তেমনি একরঙা ও রঙিন্ ছবিতে বইটি ভরা। সুন্দর কাগজে ছাপা, সুন্দরভাবে বাঁধান। প্রথম নজরেই ছোটদের মন জয় করার মত বই। **দাম—ছয় টাকা**

**দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ** ২১ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯